গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

আলকাউসার

www.alkawsar.com

জুমাদাল উলা ১৪৩৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

مجلة الكوثر الشهرية تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا [للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة]

مجلة الكوثر الشهرية

تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا (للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

আলকাউসার

বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ০২
জুমাদাল উলা ১৪৩৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ॥ পৌষ-মাঘ ১৪২৪

www.alkawsar.com

প্রতিষ্ঠা
মুহাররম ১৪২৬ হি., ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঈ.

প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা
হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী রাহ.

তত্ত্বাবধায়ক
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

সম্পাদক
মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

সহ-সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

বিনিময় : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সর্বপ্রকার যোগাযোগ
মাসিক আলকাউসার
৩০/১২, পল্লবী
(মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬

E-mail : info@alkawsar.com

ফ্যাক্স : ৮০৩৪৫০৮
মোবাইল : ০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ২২
সার্কুলেশন :
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩ (এজেন্ট)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪ (গ্রাহক)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৫৫ (হাতে হাতে)

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর
মাসিক আলকাউসার
১. চলতি হিসাব নং ১৬৪.১১০.১৭৯৩
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
মিরপুর-১০ শাখা, ঢাকা
২. চলতি হিসাব নং ১৩৫১২২০০০০১৭৩
আলআরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
পল্লবী শাখা, ঢাকা

সূচিপত্র

'ভাষার মাস'

চেতনার দীপ জ্বলুক, ঈমানের ফুল ঝরুক!

ভাষা আল্লাহর মহা নিআমত। মুখের ভাষা, কলমের ভাষা দু'টোই আল্লাহর দান। সূরাতুর রহমানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اَلرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

দয়াময় আল্লাহ, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। –সূরা রহমান (৫৫) : ১-৪

'সৃজন' আল্লাহর এক মহিমান্বিত কর্ম। বান্দার প্রতি তাঁর অসংখ্য নিআমতের শিরোনাম। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন মানুষের সত্তা ও তার গুণাবলী। আল্লাহ- প্রদত্ত সেইসব মানবীয় গুণের একটি– 'বায়ান'–ভাব প্রকাশের যোগ্যতা। যে যোগ্যতাবলে মানুষ তার মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, অন্যের ভাব ও বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করে। এরই মাধ্যমে মানুষ বোঝে ও বোঝায় দ্বীন-দুনিয়ার সকল ভালো-মন্দ। ফলে এর উপর নির্ভর করেই পরিচালিত হয় ইহলৌকিক-পারলৌকিক কর্ম-তৎপরতার এক বিরাট অংশ।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অন্য অনেক বড় বড় নিআমতের মতো এই মহানিআমতের উপলব্ধি ও শোকরগোযারিও আমাদের অনেকের মাঝে অনুপস্থিত। এক্ষেত্রেও অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার এক সর্বগ্রাসী সয়লাব প্লাবিত করে রেখেছে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনকে। মুমিন হিসেবে আমাদের কর্তব্য, এই মহাপ্লাবন থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করা।

আমাদের প্রথমেই সচেতন হতে হবে এই মানবীয় গুণটির স্বরূপ ও সূত্র সম্পর্কে। এর স্বরূপ হচ্ছে, এটি আল্লাহর নিআমত আর এর সূত্র তিনিই, যিনি আমাদের তা দান করেছেন। তিনি আল্লাহ, রাহমানুর রাহীম। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম দৈহিক ও মানসিক গঠনে; তাকে দান করেছেন বোধ-বুদ্ধি, চেতনা-উপলব্ধি, ভাষা ও বাকশক্তি। কাজেই তাঁর শোকরগোযারি আমাদের অতি বড় কর্তব্য।

শোকর ও কৃতজ্ঞতার প্রথম শর্ত কী? নিআমতের যিনি স্রষ্টা তাঁকে চেনাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতার প্রথম শর্ত। এরপর মুখে ও অন্তরে তাঁর দান স্বীকার করা, সেই দানের সুফল ও উপকারিতা স্বীকার করা, তা যে এক আল্লাহর দান অন্য কারো এতে কোনো অংশীদারত্ব নেই এই সত্য উপলব্ধি করা, স্বীকার করা ও শিরোধার্য করা।

তেমনি শোকরগোযারির এক বড় দিক, আল্লাহর নিআমত আল্লাহর মর্জি ও রেযামন্দির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, তাঁর নারাজি ও নাফরমানির ক্ষেত্রে ব্যবহার না করা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সহজ ভাষায় বাকশক্তির যথার্থ ব্যবহারের উপায় নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

যে আল্লাহ ও আখিরাতের দিবসে ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৮

বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের এক দাবি, বাকশক্তির ব্যবহারে সংযমী ও সুবিবেচক হওয়া।

কথাও মানুষের কর্মেরই অংশ, যা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। কথাতেও আছে ভালো-মন্দ, ছওয়াব-গুনাহের প্রসঙ্গ, আছে সংযম ও নিয়ন্ত্রণের বিধান। জীবনের অন্য সকল বিষয়ের মতো কথার ক্ষেত্রেও মুমিনকে চলতে হবে হালাল ও ছওয়াবের পথে, বেঁচে থাকতে হবে হারাম ও গুনাহের পথ থেকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই নীতি যেমন মুখের কথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য লেখার ক্ষেত্রেও। বরং লেখা সাধারণত কথার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ নির্দেশ পালনের মাধ্যমে মানুষ তাঁর ভাব প্রকাশের যোগ্যতার সুফল ও কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়, অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আর এভাবেই সম্পন্ন হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই মহা নিআমতের যথার্থ-মূল্যায়ন ও শোকরগোযারি।

শোকরগোযারির আরেক দিক হচ্ছে, নিআমতের সংরক্ষণ ও পরিচর্যা। ভাব প্রকাশের যে যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন মুমিনের করণীয়, এই নিআমতের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং এর পূর্ণ বিকাশ ও নিখুঁত ব্যবহারে প্রয়াসী ও পারদর্শী হওয়া। সাধারণভাবে যে কোনো ভালো কাজেই চৌকস

(বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়)

ভাষা এসেছে সত্য-ন্যায়ের গোলাব ফোটাবার জন্য, প্রীতি-ভালবাসার পুষ্প বর্ষণের জন্য। ভাষা তো নয় অবিশ্বাস-অশ্লীলতা বিস্তারের জন্য কিংবা ঘৃণা-শত্রুতার বিষ ছড়াবার জন্য। আল্লাহ-প্রদত্ত ভাষাকে যদি অবিশ্বাস-অশ্লীলতার বিস্তারেই ব্যবহার করা হয় তাহলে এর চেয়ে কি ভালো নয় মূক ও বধির হওয়া? সত্য বটে, একমাত্র ঈমানই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে। মানবের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সঠিক বিকাশ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে।

শরীয়া আইনে গণআকাঙ্ক্ষা

একটি জরিপ ও কিছু কথা

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার জরিপ করার একটা রেওয়াজ বর্তমানে চালু আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কারণে জরিপের উপর মানুষের আস্থা সৃষ্টি হয় না। কারণ, অনেক সময় বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকে সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা হয় জরিপের মাধ্যমে। কখনো বা বিশেষ কোনো পণ্যের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা হয়। কখনো ব্যবহার করা হয় বিশেষ কোনো মত বা দর্শনের প্রচারের হাতিয়াররূপে। আবার কখনো তা বাস্তবেই মতামত যাচাইয়ের একটি প্রয়াসরূপেও ব্যবহৃত হয়।

জরিপের বিষয়বস্তুও হয় বিচিত্র। সম্প্রতি অনেকটা ভিন্নধর্মী একটি জরিপের ফল দেখা গেল একটি জাতীয় দৈনিকে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭-এর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত জরিপটির শিরোনাম ছিল, 'গণতন্ত্র ও শরীয়া আইন : জনমত দুটিরই পক্ষে।' সংবাদটি অনলাইন সংস্করণে পড়েই মনে হল, এ নিয়ে কিছু কথা আলকাউসারের পাঠকবৃন্দের সাথে বলা যেতে পারে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জরিপটি করেছে 'রিজলভ নেটওয়ার্ক' নামক একটি সংস্থা। যারা কিনা সহিংস উগ্রবাদ নিয়ে বিশ্বের ২৫টির বেশি দেশে গবেষণা করে থাকে। ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশের ৪ হাজার ৬৭টি পরিবারে এরা জরিপ করেছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে এসব পরিবার বাছাই করা হয়। উত্তরদাতাদের ৫০ শতাংশ পুরুষ ও ৫০ শতাংশ নারী। এদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতার বসবাস গ্রামে।

জরিপে দেখা গেছে, ৯১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটি মর্মবস্তু হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব। তবে ৮০ শতাংশের বেশি মনে করেন, শরীয়া আইন মৌলিক সেবা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করে।

এখানে আমরা দেখছি, জরিপে দুটি বিষয় : গণতন্ত্র ও শরীয়া আইন। আজকে গণতন্ত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ইচ্ছে নেই তবে একটি কথা না বললেই নয়। আর তা হচ্ছে, এখন তো দেশে-বিদেশে 'গণতন্ত্র' চলছে। জনগণ নিজেরা যেমন গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাও তাদের সামনে রয়েছে। একইসাথে গণতন্ত্রের সুবিধা ও সুফল নিয়ে গোটা বিশ্ব জুড়েই রয়েছে প্রচার-প্রচারণা। কিন্তু এর পরও কেন ব্যাপক সংখ্যায় গণমানুষের বর্তমান 'গণতন্ত্রে'র প্রতি আস্থা অটুট নেই? কী সেই শূন্যতা, যার কারণে এতকিছুর পরও সাধারণ মানুষ আরো কিছুর প্রত্যাশা করছে? যাদের ঈমানী বসীরত আছে এবং যারা আকিদায়ে তাওহীদকে যথাযথ উপলব্ধি করেছেন এবং তা পুরোপুরি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন তারা জানেন, সেই শূন্যতা মূলত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াতের অনুপস্থিতি এবং ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তি। দুনিয়ার কোনো ধর্ম এবং কোনো ইজম যে ইসলামী শরীয়াত ও ইসলামী খেলাফতের বিকল্প হতে পারে না– এটাই মূল কারণ। কিন্তু এতটুকু তো সবাই বুঝে যে, বর্তমানে দেশে দেশে পুঁজিবাদী ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাবশালী ও দুর্নীতিবাজেরা গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকলেও 'জনগণের সরকার' কিন্তু খুব কম দেশেই কায়েম হচ্ছে। উল্টো বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাবান পুঁজিপতিগণ প্রচারমাধ্যমগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে রাত-দিন মানুষকে উন্নয়ন ও স্বাধীনতার কথা শুনিয়ে একতরফা শাসন করে যাচ্ছে। আর নিরীহ জনগণ সব কিছু বুঝেও ক্ষমতাবানদের জুলুমের ভয়ে চুপ থাকছে। আজ থাক সে কথা, তবে সে বিষয়টি খুব নির্মোহভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

জরিপে শরীয়া আইনের প্রতি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এই প্রথম নয়। এর আগে ২০১১-২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপেও এসেছিল, বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ৮২ শতাংশই শরীয়া আইনের পক্ষে। ওই জরিপে এসেছিল, এ দেশের ধর্মপালনকারী মুসলমানদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ এমন আইন চান। অন্যদিকে ধর্মপালনে নিয়মিত নন এমন ৭৯ শতাংশ ব্যক্তিও শরীয়া আইনের পক্ষে। লক্ষণীয় যে, দুটো জরিপই ভিন্ন মতের দুটি প্রতিষ্ঠানের, যাদের শরীয়া আইনের প্রতি দুর্বলতা থাকার সম্ভাবনা নেই। এ কারণে জরিপের ফল বাস্তবতার কাছাকাছি বলেই অনুমিত হয়।

শরীয়া আইন কী?

এ বিষয়ে লিখতে গেলে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীবন-চলার জন্য মানুষকে কুরআনুল কারীমে যে বিধিবিধানগুলো দিয়েছেন, আল্লাহর সর্বশেষ নবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে যে হুকুম-আহকামগুলো জারী করে গেছেন এবং এ দু' শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত নীতিমালাগুলোর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক যেসব শাখাগত বিধানাবলী প্রস্তুত হয়েছে সেগুলোর নামই শরীয়াহ।

এ আইনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বৃহৎ অঞ্চল হাজার বছরের অধিক কাল ইনসাফের সাথে শাসিত হয়েছে। গণমানুষ ভোগ করেছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা, পেয়েছে ন্যায়বিচার, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও ঈমান নিয়ে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা। যেখানে বিচারকেরা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে শরীয়াভিত্তিতে রায় দিয়ে গেছেন। কোনো খলিফা-বাদশার তাতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ছিল না। আইনের চোখে সবাই সমান, ধনী-গরীব ও শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকলের জন্য বিচারকদের চোখ একভাবেই কাজ করবে– এই কথাগুলো একমাত্র শরীয়া আইনের ক্ষেত্রেই বাস্তবিক অর্থে কার্যকরী ছিল শত শত বছর।

এরপরের ছন্দপতনের ইতিহাস সকলের জানা। একশ্রেণীর মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়া, অন্যদের বহুবিধ ষড়যন্ত্র এবং আরো বহু কারণে বিজাতীয় আগ্রাসনের জাঁতাকলে পতিত হয় মুসলিম সমাজ। সাথে সাথে বিদায় করে দেয়া হয় অহী-ভিত্তিক শরীয়া আইনকে। চাপিয়ে দেয়া হয় মানবরচিত সংবিধান। আগ্রাসী শক্তি একসময় নামেমাত্র স্বাধীনতা দিয়ে বিদায় নিয়েছে; কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এখনো দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে মুসলিম সমাজকে। কিন্তু চাইলেই কি স্থায়ীভাবে দাবিয়ে রাখা সম্ভব? আলোচিত জরিপ তো ভিন্ন কিছুরই ইঙ্গিত দেয়। কৃত্রিমতা তো আর স্থায়ী হতে পারে না। তাই জরিপের ঐ ফল বিভিন্ন কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন :

এক. শরীয়া আইনের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা রয়েছে। এই আইনের ব্যাপারে জনমনে ভীতি ও অশ্রদ্ধা সৃষ্টির প্রয়াসও মোটেই কম নয়। প্রচলিত প্রায় সকল প্রচারমাধ্যম ব্যাপকভাবে এই প্রয়াসের সাথে যুক্ত। কিন্তু এরপরও গণমতের যে প্রতিফলন আলোচিত জরিপে দেখা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে এইসব

প্রচার-প্রচারণাকারীদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। বলা যায়, এই ব্যাপক প্রয়াস ও আগ্রাসন অনেকটাই ব্যর্থ। এটাই হচ্ছে সত্য-ন্যায়ের শক্তি। সত্য ও ন্যায়কে হয়ত সাময়িকভাবে চাপা দিয়ে রাখা যায়, কিন্তু নির্মূল করা যায় না; আরোপিত বাধা-নিষেধ অপসারিত হয়ে গেলেই সত্য তার আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। এ কারণে এই বিশ্বাস মোটেই অলীক বিশ্বাস নয় যে, শরীয়ার বিপক্ষশক্তি চূড়ান্ত পর্যায়েও হতাশ হবে– ইনশাআল্লাহ।

দুই. এখানে ক্ষমতাবানদেরও চিন্তা-ভাবনার খোরাক রয়েছে। এখন অনেক মুসলিম ভূখণ্ডের নেতৃত্বকেই দেখা যাচ্ছে, ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বিপরীতে ভিন্ন মতাদর্শ অবলম্বন করে ক্ষমতা পাকা করার চেষ্টা করতে। তাদের বুঝতে হবে যে, বাহ্যিক প্রচার-প্রচারণায় যা-ই থাকুক, মুসলিম জাতির কাছে ইসলামই প্রথম ও শেষ কথা। কর্ম-জীবনে অন্যায়-অপরাধ থাকতে পারে কিন্তু মুসলিমের অন্তরের গভীরে রয়েছে ইসলামের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে অগ্রসর হতে পারলেই জনগণের কাছে যাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে বাইরের প্রচারণার কারণে তারা যদি মনে করেন, বাস্তবেই শরীয়ার প্রতি বৃহত্তর জনগণ আস্থাশীল নন তাহলে এটা হবে তাদের ভুল ও অবাস্তব ধারণা, যা তাদেরকে জনগণ থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

তিন. ইসলামী দাওয়াতের সাফল্যপ্রত্যাশীদের জন্যও এখানে শিক্ষা রয়েছে। বর্তমান নানামুখী হতাশাজনক পরিস্থিতিতে হতোদ্যম হওয়ার এবং অতি উৎসাহী কিংবা হাতাশাগ্রস্ত হয়ে অবিবেচনা প্রসূত শক্তি প্রদর্শন বা অপাত্রে মূল্যবান জান বিলিয়ে দেয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ইসলাম আল্লাহর সত্য দ্বীন। মানবতার সর্বাঙ্গীন কল্যাণের ধারক এই দ্বীন, কাজেই পরিস্থিতি যা-ই হোক, পরিণামে এই দ্বীনই বিজয়ী হবে।

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়...। –সূরা রা'দ (১৩) : ১৭

আমাদের কর্তব্য, শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে দাওয়াতী দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। জনগণের কাছাকাছি যাওয়া, মানুষের মধ্যেকার ঈমানী চেতনা ও ইসলামপ্রীতিকে কাজে লাগিয়ে তাদের ভুলত্রুটিগুলো প্রজ্ঞার সাথে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করা। সর্বোপরি কথা ও কাজে দ্বীনী দাওয়াতের কল্যাণকামিতার বৈশিষ্ট্য সর্বস্তরের মানুষের সামনে তুলে ধরা।

ইসলামের পাশাপাশি গণতন্ত্র চলতে পারে বলে সাধারণ জনগণের যে মত উক্ত জরিপে প্রকাশিত হয়েছে এর অর্থ– গণতন্ত্রের অতটুকুই নেয়া যাবে, যতটুকু শরীয়া অনুমোদন করে। এ বিষয়েও মুসলিম জনগণের সঠিক রাহনুমায়ী দাঈগণের কর্তব্য।

জরিপটিতে কিছু খুচরো বিষয়ও রয়েছে। যেমন, তাতে দেখা যাচ্ছে, শরীয়া আইনের প্রতি নারীদের দুর্বলতা বেশি। প্রায় ৭৮ শতাংশ নারী উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে, শরীয়া আইন সবাইকে পর্দা, হিজাব-নেকাবে বাধ্য করবে তথাপি শরীয়া আইনই তাদের কাম্য। বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার তার অন্যতম প্রধান হচ্ছে, ইসলাম নারীকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করেছে (নাউযুবিল্লাহ।) অথচ বাস্তবতা হচ্ছে একমাত্র ইসলামই হচ্ছে ঐ দ্বীন ও আদর্শ, যা সকল যুগের সকল জাহেলিয়াতের জুলুম-অত্যাচার থেকে নারীর মুক্তির একমাত্র উপায়। অতীতেও ইসলামই নারীকে মুক্তি ও মর্যাদা দিয়েছে। ভবিষ্যতেও নারীর মর্যাদার নিশ্চয়তা ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে যত অপপ্রচারই হোক, দেখা যাচ্ছে, বাস্তবতা সম্পর্কে নারীসমাজ গাফিল নন। নানা মোহনীয় শ্লোগানের পাশাপাশি ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ নারী তথাকথিত নারী-স্বাধীনতা ও প্রগতিতে আস্থাশীল নন, তাঁদের আস্থা হিজাব-নেকাবের বিধানদানকারী শরীয়া আইনের প্রতি। তথাকথিত নারী-স্বাধীনতাবাদীদের এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কী হতে পারে?

আরেকটি ব্যাপারও এই জরিপে আছে, তা হচ্ছে মতামত প্রদানকারীদের ৭৫ শতাংশ গ্রামের অধিবাসী। জানি না এই তথ্য ভিন্নভাবে দেয়ার উদ্দেশ্য কী, তবে একটি সাধারণ কথা হচ্ছে, গ্রামের মানুষ শহরের মানুষ অপেক্ষা সরলতা ও স্বাভাবিকতার কাছাকাছি হয়ে থাকে। শহুরে নাগরিকদের অনেকের মধ্যেই নানা অরোপিত মত ও দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। চিন্তা-ধারা থেকে আচার-আচরণ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় আরোপিত অবস্থার ছাপ। এ কারণে প্রকৃতির অধিক সান্নিধ্য লাভকারী গ্রামবাসী সরলতা ও স্বাভাবিকতায় শহরের চেয়ে সাধারণত এগিয়েই থাকে। তবে হ্যাঁ, ব্যতিক্রম সবকিছুতেই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই। কাজেই উপরোক্ত তথ্য যে উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হোক এটা জরিপের ফলাফলের পক্ষে ইতিবাচকই বটে।

এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মুখে ছাই

কয়েকবছর আগে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় কলুষিত হয়েছিল একটি রায়ের মাধ্যমে, যার দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাক্যটি ছুঁড়ে ফেলে সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বসানো হয়েছে। আমরা মনে করি এটি এবং এজাতীয় ধর্মবিদ্বেষী অন্য রায়গুলো দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিতে সক্ষম হলেও চূড়ান্ত বিচারে সংশ্লিষ্ট রায়দাতাগণই কলঙ্কিত হয়েছেন এবং এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে তারা সর্বদাই কুখ্যাত হয়ে থাকছেন। মানুষ সুযোগ পেলেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। যেমন দেখা গেছে আলোচিত জরিপে।

এদেশে কিছুলোক মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে থাকে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ ছিল। দাবি যে সম্পূর্ণ অসত্য ও অবাস্তব তা আমরা এর আগেও বিভিন্ন সময় তথ্য ও যুক্তি দিয়ে লিখেছি। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে এ-ও বলেছিলাম, এখনো যদি এদেশে সত্যিকার অর্থে গণভোট করা হয় যে, 'দেশের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতা চায় না ইসলাম চায়' তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয়টির পক্ষে মত আসবে।

আলহামদু লিল্লাহ, ভিন্নমতের সংস্থার জরিপেও বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ সে জবাবই দিয়েছেন। সুতরাং সংশ্লিষ্টদের উচিত, মানুষকে মনগড়া ধর্মনিরপেক্ষতার কথা না শুনিয়ে ইসলামের সত্য-ন্যায়ভিত্তিক শরীয়া আইনের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া।

সবশেষে যে কথাটি আবারো বলতে চাই, তা হচ্ছে– হতাশার কোনো কারণ নেই। ইসলামের দাওয়াতের জন্য এই ভূখণ্ড উর্বর। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, মুসলিম জনগণের আরো কাছে যাওয়া। আলিম-উলামা, ইমাম-খতীব, দাঈ-মুবাল্লিগ সবারই কর্তব্য, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পূর্ণ উদ্যম ও আশাবাদিতার সাথে দাওয়াত, তালীম ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করা। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে, বিশেষত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণের মাঝে দ্বীনী বোধ-চেতনা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো, যাতে যে চেতনার প্রতিফলন এখন জরিপের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে তা যেন দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আল্লাহর বান্দারাই যেন আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের আওয়াজ তোলে। মানুষ যখন ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিশদ পরিচয় লাভ করবে, দুনিয়া-আখেরাতে এর সুফল সম্পর্কে সচেতন হবে তখন এরাই সর্বপ্রকার কৃত্রিম ও জুলুমের ব্যবস্থা থেকে, মানবরচিত আইন থেকে আল্লাহর আইনের দিকে, ইসলামের পবিত্র ও কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে আসবে।●

পথের সন্ধানে

ইসলামী আকায়েদই ঈমানের ভিত্তি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার উপর সবচে' বড় ফরজ হল, ঈমান। ঈমান বান্দার উপর আল্লাহর সবচে' বড় হক। ঈমানের পরিচয় হল, ইসলামকে একমাত্র সত্যধর্ম মেনে কবুল করে নেওয়া। ইসলাম আকায়েদ ও আহকামের সমষ্টি। ইসলামের বর্ণিত সঠিক আকায়েদ, ইসলামের প্রদত্ত শরীয়ত মেনে নেওয়ার নাম ঈমান।

আকায়েদ মানা, ইসলামী শরীয়ত অস্বীকার করা অথবা শরীয়ত মানা, ইসলামী আকায়েদ অস্বীকার করা উভয়ই কুফর। এ কুফর থাকা অবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। যেমনটি আমি 'উম্মাহর ঐক্য' বইয়ে বিস্তারিত লিখেছি। শাখাগত মাসআলায় তো দলীলভিত্তিক মতবিরোধ সম্ভব। এমন মতবিরোধ হয়েছেও। ঐ মতবিরোধের দরুণ আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে মন্দ বলেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে মতবিরোধের আদব-কায়দা রক্ষা করতে আমরা বাধ্য এবং এ ধরনের মতবিরোধ ঝগড়া বিবাদের মাধ্যম যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কিন্তু আকায়েদের ব্যাপারটি (মুমিন ও মুসলিম হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং সেগুলো সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি) সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে দলীলভিত্তিক মতবিরোধের কল্পনাও করা যায় না। আকায়েদের বেলায় বিরোধ হয় সত্য-বিরোধীদের অন্যায় বিরুদ্ধাচরণ অথবা মূর্খতার কারণে। আকায়েদের ক্ষেত্রে বিরোধ আল্লাহ তাআলা মেনে নেননি। এক্ষেত্রে সবাইকে একমাত্র দ্বীন কবুল করে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণকারীদের যালেম, ফাসেক ও কাফের আখ্যায়িত করেছেন। সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আল্লামা খালেদ মাহমূদের ভাষায়–

'ইসলামী আকায়েদে এ কথা অকাট্য যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একটাই। তা হল, ইসলাম। এ হতে পারে না যে, অন্যান্য ধর্ম আপন আপন জায়গায় সঠিক। সে মতবাদ অনুযায়ী চলেও পরকালে মুক্তি লাভ হবে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান না এনে কেউ মুক্তি পাবে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাযিআল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় আহলে কিতাবদের ইসলামের দাওয়াত দিতে বলেছিলেন। সেসব দ্বীন আপন আপন ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার যোগ্য হলে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাযিআল্লাহু আনহুকে এ নির্দেশনা দিয়ে ইয়ামান পাঠান–

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

তুমি আহলে কিতাবের (ইহুদী ও নাসারাদের) কাছে যাচ্ছ। প্রথম তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার দাওয়াত দিবে এবং এ কথার শাহাদাত প্রদানের দাওয়াত দিবে– মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তারা এ কথা মেনে নিলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাআলা দিন ও রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৩৮, হাদীস ২৯; সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৪৯৩, হাদীস ৪৩৪৭)

ইমাম তহাবী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আলআকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ' কিতাবে বিষয়টি এভাবে লেখেন–

ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.

আসমান ও জমিনের অধিবাসী সবার জন্য আল্লাহ তাআলার মনোনীত দ্বীন একটিই। তা হল, দ্বীনে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯) আলআকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭৮৬

ইবনে হাযম জাহেরী রাহ. লেখেন–

الإسلام دين واحد، وكل دين سواه باطل.

অর্থাৎ ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম। এছাড়া সব ধর্মই বাতিল। (আলমুহাল্লা, ইবনে হাযম, খ. ১, পৃ. ১০৪)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আকীদাকে পেশ করেছেন এভাবে–

من لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم.

অর্থাৎ যে অন্তর ও মুখে একথা স্বীকার করে না, আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, তাকে মুসলমান ধরা হবে না। –ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খ. ২৭, পৃ. ৪৬৩

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল সকল ধর্ম হক হওয়ার মতাবলম্বীরা ইসলামের দাবি করা সত্ত্বেও মুসলমান নন। (আকায়েদে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের মাসউদের ভূমিকা, পৃ. ৪৫-৪৬ থেকে গৃহিত)

শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা সালীমুল্লাহ খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য হল, মানুষের নিজস্ব বলতে কিছু নেই। অস্তিত্ব তার নিজস্ব নয়। বিবেক ও প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বোধ নিজস্ব নয়। শোনা, দেখা এবং বলার শক্তিও নিজস্ব নয়। এ সবই খোদাপ্রদত্ত। নিঃস্ব এ মানুষের কাছে আছে কেবল শূন্যতা। এ শূন্যতা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ শূন্যতার মালিকও সে নয়।

আসলে আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকে এসব মূল্যবান নিআমতে ভূষিত করেছেন। বিবেকের সিদ্ধান্ত হল, পুরস্কারদাতা ও অনুগ্রহকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জরুরি। আর যে নিআমতদাতা এত উদারতার সঙ্গে অসংখ্য অগণিত নিআমত দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় তো যে কোনো অনুগ্রহকর্তা ও নিআমতদাতার চেয়ে বেশি করা জরুরি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সর্বপ্রথম জরুরি কাজ হল, মহাপবিত্র খোদার সত্তা ও গুণ সংশ্লিষ্ট আকীদা সঠিক হতে হবে, তিনিই আহাদ–এক। সামাদ–তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী এবং ইবাদতের যোগ্য তিনিই। তিনিই আমাদের সবার খালিক ও মালিক। তিনিই প্রতিপালক, তিনিই রিযিকদাতা, তিনিই মৃত্যু ও

জীবনদাতা। অসুস্থতা-সুস্থতা, ধনাঢ্যতা-দারিদ্র্য, লাভ-ক্ষতি শুধুই তাঁর ক্ষমতাধীন। সব মাখলুক তাঁরই সৃষ্টি করা। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। এ সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কেউ তাঁর অংশীদার কিংবা পরামর্শক নেই। কেউ তাঁর হুকুম বদলাতে পারে না। না তাঁর কাজে কারও দখল দেওয়ার অবকাশ আছে। তিনি মালিকুল মুল্‌ক– রাজাধিরাজ। আহকামুল হাকিমীন– মহা বিচারক। এজন্য তাঁর প্রতিটি হুকুম মানা জরুরি। তাঁর হুকুমের বিপরীতে অন্য কারও হুকুম কখনো মানা যাবে না। চাই সে শাসনকর্তা, বাবা-মা কিংবা গোত্রপতি অথবা নিজের প্রবৃত্তি হোক।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হোক আমাদের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা, আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হোক আমাদের আমল ও শান। এ আকীদাই দ্বীনের মূল ভিত্তি। সমস্ত নবীর সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ছবক। সাত আসমান, সাত জমিন এবং যা কিছু তাতে আছে সব এক পাল্লায় রাখা হলে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অপর পাল্লায় রাখা হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র পাল্লা ভারী হবে। এ ফযীলত ও ওজন এজন্য যে, এ কালেমায় আল্লাহর তাওহীদের অঙ্গিকার ও স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে। তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করার, তাঁরই আদেশ মতো চলার, তাঁকেই পরম প্রার্থিত বানানোর, তাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক করার সিদ্ধান্ত ও অঙ্গিকার। এটাই ঈমান ও ইসলামের রূহ।

হাদীসে এসেছে–

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

হে লোকসকল, ঈমান তাজা করে যাও। প্রশ্ন করা হল, কী করে ঈমান তাজা করব? বললেন, বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৭১০; আলমুসতাদরাক, হাকেম, হাদীস ৭৬৫৭; আলমুনতাখাব মিন মুসনাদি আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, হাদীস ১৪২৪

সে আল্লাহ জীবিত, জ্ঞানের অধিকারী, ক্ষমতাধর, সিফাতে কালামের অধিকারী, ইচ্ছা ও শ্রবণশক্তির অধিকারী, সৃষ্টি ও সৃজন তাঁর গুণ। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সম্মান ও লাঞ্ছনা তিনিই দেন।

محمد رسول الله কালেমার এ অংশে হযরত মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা আছে। যার মর্ম হল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে পৃথিবীবাসীর হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন, যে খবর দিয়েছেন সব সঠিক। যেমন, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া, ফেরেশতার অস্তিত্ব, কিয়ামত সংঘঠিত হওয়া, মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়া, নিজ নিজ আমল অনুযায়ী জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়া ইত্যাদি। রাসূলের প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যই হল, তাঁর সব কথা মানা। তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েতকে আল্লাহ তাআলার শিক্ষা ও হেদায়েত মনে করা এবং তাঁর বিধান মোতাবেক চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কেউ যদি কালেমা পড়ে কিন্তু এ সিদ্ধান্ত না নেয়, আমি নবীজীর বর্ণিত প্রতিটি কথা একেবারে সত্য এবং তাঁর বিপরীতের সব কথা ভুল বলে বিশ্বাস করব, তাঁর আনীত শরীয়ত ও হুকুম অনুযায়ী চলব– তাহলে এমন মানুষ মুসলমান বলে গণ্য হবে না। কালেমা মূলত একটি অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি। এর মর্ম এটাই– আমি শুধু আল্লাহ তাআলাকে সত্য খোদা এবং মাবুদ ও মালিক মানি। দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর চেয়ে তাঁর সাথে বেশি মুহাব্বত ও সম্পর্ক রাখছি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য রাসূল মানছি। উম্মতের এক সদস্যের মতো আমি তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করব এবং তাঁর আনীত শরীয়তের উপর আমল করতে থাকব।

আকায়েদের বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ। আকীদা দ্বীনে ইসলামের মূল বিষয়। আমল হল, তার শাখা। আকীদা ঠিক না হলে দোযখে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে হবে। আমলে অবহেলা হলে নাজাতের আশা করা যায়। নাজাত হয়ত শুরুতেই লাভ হবে অথবা শাস্তি ভোগ করার পর। (আকায়েদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পৃ. ২৮-৩০)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামী আকীদার যথার্থ ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার তাওফীক দান করুন। ঈমান নবায়নের এমন তাওফীক দান করুন, যার প্রভাব আমাদের কথা ও কাজ, আমাদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে দৃশ্যমান হয়।

আমাদেরকে এ বাস্তবতাও মনে রাখতে হবে, যা হযরত মাওলানা আব্দুল হক খান বশীর লিখেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের স্বীয় যুগের ইমাম হযরত মাওলানা সারফরায খান সফদর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যার পূর্ণ সমর্থন করেছেন এভাবে–

'উপমহাদেশ পাক-ভারতে গত চার শতাব্দীর মধ্যে অসংখ্য ফেতনার জন্ম হয়েছে। মুসলমানদেরই কিছু মূর্খ ও স্বার্থপর ধর্মীয় নেতৃত্বের কারণে শিরক ও বিদআতের উত্থান হয়। কবর পূজার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। অগণিত শরীয়তবিরোধী প্রথার জন্ম হয়। চিন্তাগত কুবিশ্বাস মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। খতমে নবুওত, হাদীসের প্রামাণ্যতা, সুন্নাহর প্রামাণ্যতা, তাকলীদের প্রামাণ্যতা, মুজিযা ও কারামাতের বাস্তবতা, সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা এবং নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার মতো শরীয়ত বর্ণিত সর্বসম্মত আকীদা অস্বীকার করে বিভ্রান্তির নতুন পথ খোলা হয়েছে।

এ অবস্থায় ইমামে রাব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফেসানী হযরত শাইখ আহমদ সারহিন্দী রাহ., হাকীমুল হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. এবং সিরাজুল হিন্দ হযরত ইমাম শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রাহ. প্রমুখ বুযুর্গগণ সমস্ত জটিলতা সহ্য করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারাস আকীদা হেফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁদের পর তাদের প্রকৃত জ্ঞানগত আত্মিক উত্তরাধিকারী আকাবিরে দেওবন্দ এ দায়িত্ব যথাযথ সামলান। এদিক থেকে তাঁদের চেষ্টা-মেহনত অন্যান্য দল থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না; এ যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারাস আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি হেফাজতের ক্ষেত্রে দেওবন্দের বুযুর্গদের উপমা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে তাদের মেধা, চিন্তা, জ্ঞান ও বোধ এ চেষ্টা ও মেহনতে ব্যয় করেন। যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারাস আকীদা ও চিন্তায় কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অনুপ্রবেশ করতে না পারে। এমনকি এ প্রচেষ্টায় নিজের আপনজন বাধা হলেও তাদেরকে নিজেদের থেকে পৃথক করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যার একাধিক উদাহরণ আছে।

দেওবন্দের পূর্বসূরিদের এই আন্তরিকতা, দ্বীনদারিতা ও দায়িত্বশীলতা ও পূর্ণ প্রচেষ্টার ফলাফল হয়েছে এই– আজ আমরা পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এ দাবি করতে পারি, আলহামদু লিল্লাহ আমাদের কাছে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা সে অবস্থাতেই আছে এবং সে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহই আছে, যে অবস্থায়, যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলমানদের কাছে ছিল। দেওবন্দের পূর্বসূরিদের জ্ঞানগত ও আত্মিক উত্তরাধিকারীরা কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা সংরক্ষণের এ দায়িত্ব পালন করে যাবে। (আকায়েদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পৃ. ৩৫-৩৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা গ্রহণ করা, তার উপর অবিচল থাকা এবং তার সংরক্ষকদের কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফীক দান করুন– আমীন।

বুধবার
২২ রবিউস সানি, ১৪৩৯ হিজরী
১০ জানুয়ারি, ২০১৮ ঈসাব্দ

ইচ্ছাপূরণের অত্যাচার ঘরে-বাইরে

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

হযরত আনাস ইবন মালিক রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, আমি নামায শুরু করি আর আমার ইচ্ছা থাকে তা দীর্ঘ করার। এ অবস্থায় যখন কোনও শিশুর কান্না শুনি, আমি নামায সংক্ষেপ করে ফেলি। কারণ আমি জানি, তার কান্নায় তার মায়ের কী কঠিন কষ্ট হয়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১০

কী বোঝা গেল এ হাদীস দ্বারা? এতটুকু কথা তো স্পষ্ট যে, নামায অবস্থায় কোনও শিশুর কান্না শুনতে পেলে তার মায়ের কষ্ট হয় বিবেচনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সংক্ষেপ করে দিতেন। নামায ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। তিনি ইরশাদ করেছেন, নামাযে আমার নয়ন জুড়ায়। নামায দ্বীনেরও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কুরআন মাজীদে সবচে' বেশি হুকুম নামায কায়েমেরই দেওয়া হয়েছে। তো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সবচে' বেশি প্রিয় এ বিধান পালনে রত থাকা অবস্থায় শিশুর কান্না শুনে তা সংক্ষেপে শেষ করার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি অন্যের আবেগ-অনুভূতির কতটা মূল্য দিতেন এবং অন্যের কষ্ট-ক্লেশের প্রতি কী গভীর লক্ষ রাখতেন।

বস্তুত নিজ আমল ও সে আমলের ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে অন্যের আবেগ-অনুভূতি ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। নিজ ইচ্ছাপূরণই বড় কথা নয়। এমনকি সেই ইচ্ছা যদি ইবাদত-সংক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখাও জরুরি।

কোনও মানুষই একা এক ব্যক্তি মাত্র নয়। কোনও না কোনওভাবে অন্যের সংগে তার সংশ্লিষ্টতা থাকেই। যখন ঘরে থাকে, পরিবারের লোকজনের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকে। যখন বাইরে যায়, সেখানে থাকে আরও বিস্তৃত পরিমণ্ডলের সাথে সম্পৃক্ততা। একদম একা সে কোনও অবস্থায়ই থাকে না। একদম একা যখন সে নয়, তখন নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও একান্তই তার একার বিষয় ভাবার সুযোগ নেই। সেরকম ভাবতে গেলে দেখা দেয় নানা বিপত্তি। পারিবারিক ও সামাজিক সব ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যাপকভাবেই এরকম বিপত্তিতে আক্রান্ত।

অধিকাংশ লোক নিজ ইচ্ছাকে একান্তই নিজের বিষয় হিসেবে দেখছে। যখনই তার মনে কোনও ইচ্ছা জাগে তা পূরণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিপার্শ্ব নজরে রাখে না। চিন্তা করে না তার ইচ্ছাপূরণের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কি না। তার হয়তো ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। তাতে সে আরাম পাবে। ইচ্ছাপূরণজনিত তৃপ্তি বোধ হবে। এর পাশাপাশি যাদের সংগে সে কোনও না কোনওভাবে সম্পৃক্ত, তাদের যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হবে, তাতে তাদের জান-মালেরও ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা রয়েছে, অন্ততপক্ষে মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হবে তা ভাবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করছে না। এভাবে প্রত্যেক সক্ষম ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্টজনেরা সমানে তার ইচ্ছাপূরণের নির্যাতন ভোগ করছে। ঘরে-বাইরে এর দৃষ্টান্তের কোনও অভাব নেই।

ঘরে স্বামীর ইচ্ছা– পাঁচজন মেহমান খাওয়াবে। ইচ্ছা যখন জেগেছে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সুতরাং সে তাদের দাওয়াত করে ফেলল। তাদের যাতে পরিতৃপ্তি হয় এবং নিজেরও সম্মান রক্ষা হয়, সেই বিবেচনায় বাজার করে আনল। খুব ভালো কথা। মেহমান খাওয়ানো প্রশংসনীয় কাজ। সহীহ নিয়তের সংগে করলে এর ছওয়াবও অনেক। কিন্তু বিষয়টা যেহেতু তার ও মেহমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর আয়োজন ও বন্দোবস্তে ঘরের অন্যান্য লোকেরও সংশ্লিষ্টতা আছে, তাদের মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপার আছে, তখন তার উচিত ছিল ইচ্ছাপূরণে নেমে পড়ার আগে তাদের মতামত জানতে চাওয়া। কিন্তু সে তা জানতে চায়নি। সরাসরি ইচ্ছাপূরণের দায়ভাগ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সাক্ষাৎ নির্যাতন।

পারিবারিকভাবে এরকম সাধ জাগে স্ত্রীর, সাধ জাগে ছেলের এবং সাধ জাগে মেয়ের। সাধের আছে নানা রকমফের। প্রত্যেকে আপন-আপন সাধ আপনিই পূরণ করতে যায় বা পূরণ করতে চায়। অন্যকে জিজ্ঞেস করার গরজ বোধ করে না। তা পূরণে করতে হয় অর্থব্যয়। হয়তো সেই বাড়তি অর্থব্যয়ের বাড়তি চাপ খামোখাই অন্যকে পোহাতে হয়। অথবা সেই ইচ্ছাপূরণে সৃষ্টি হয় কোলাহলের, যে কোলাহলে মাতোয়ারা হওয়ার জন্যে অন্যরা প্রস্তুত ছিল না। তা প্রস্তুত নাই বা থাকুক, একজনের উটকো ইচ্ছাপূরণের মাশুলে মাথাব্যাথা ভোগ তাদের করতেই হবে। কিংবা সেই সাধ পূরণে প্রয়োজন অতিরিক্ত সময়ব্যয়ের। হয়তো সেই সময়ের একটা ভাগাভাগি অন্যদের সংগে ছিল। কিন্তু আপন মনের সাধ মেটাতে গিয়ে সেই ভাগাভাগির কোনও তোয়াক্কা সে করল না। তার তো সাধ মিটল। অন্যদের সময় বৃথা গেল। কারণ তার অভাবে যৌথ বা সামষ্টিক কাজ অন্যদের পক্ষে করা সম্ভব হল না। সেই না হওয়ার কষ্টে তারা একশা।

পারিবারিক জীবনে একের ইচ্ছা পূরণে অন্যদের নানামাত্রিক অপূরণের দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টান্তের সংখ্যাবৃদ্ধির কোনও ফায়দা নেই। আসল কথা হচ্ছে এতটুকু বিষয় বুঝে নেওয়া যে, অন্যের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় না রেখে কেবলই নিজ ইচ্ছার ভেতর বুঁদ হওয়া সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। অন্যের স্বার্থের তোয়াক্কা না করে আপন ইচ্ছা পূরণে ব্যাপৃত হওয়া শুধু পারিবারিক শান্তিই বিঘ্নিত করে না, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা তো এটাই যে, নিজ ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রে অন্যের সুবিধা-অসুবিধার মর্যাদা দাও। তা পার্থিব ইচ্ছাপূরণের বেলাতেই নয়, এমনকি ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও। তিনি তো শ্রেষ্ঠতম ইবাদত নামাযকেই দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন।

পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী দীর্ঘ সময়ব্যাপী নফল নামায পড়ছেন বা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছেন কিংবা অন্য কোনও যিকরে রত আছেন। খুব ভালো কথা। ঘরকে কবর বানানো উচিত নয়। মু'মিন ব্যক্তি নফল ইবাদত-বন্দেগীর নূরে নিজ ঘরকে প্রাণবন্ত করেই রাখবে। কিন্তু সময়টা যদি হয় দীর্ঘ, তবে পাশাপাশি অন্যদের দিকে লক্ষ রাখাও কর্তব্য। অন্যের কোনও কাজে ব্যাঘাত ঘটছে না তো? অন্যের কোনও রকম সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কি? সম্মিলিত কোনও জরুরি কাজ পড়ে নেই তো? আমার কারণে অন্য কেউ

কোনওভাবে আটকে রয়নি তো? ইত্যাদি।

পারিবারিক বৃত্তের বাইরেও আপন ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে অন্যের ব্যাঘাত ঘটানো হয়ে থাকে নানাভাবে। এক ছাত্র অন্য ছাত্রের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায়। কিছু ছাত্র সম্মিলিতভাবে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিবেশ ধ্বংস করে। মহল্লার কিছু তরুণের ইচ্ছা জেগেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের। এই নিয়ে তাদের উৎপাতে গোটা মহল্লার নাভিঃশ্বাস ওঠে। কারও বাড়িতে বিবাহানুষ্ঠান। সেই বাড়ির যুবক-যুবতীদের ইচ্ছা অনুষ্ঠানটিকে আনন্দে উন্মাতাল করে তোলার। উন্মত্ত তারা ঠিকই হয়, কিন্তু সেই আনন্দ কত লোকের পক্ষে কত রকম অত্যাচারের কারণ হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এর খুব তাজা দৃষ্টান্ত গোপীবাগ আর. কে. মিশন রোডের ফ্লাট-বাসিন্দা নাজিমুল হকের মর্মান্তিক মৃত্যু। সেখানে এক কমিউনিটি হলে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। মুসলমানদের বিবাহে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান কতটা শরী'আতসম্মত, আয়োজকগণ সে বিবেচনা তো করেনইনি, উপরন্তু অনুষ্ঠানটিকে আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা করে তোলার ইচ্ছায় সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা রাখেন। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে কত উচ্চস্বরে গান বাজানো হয় কারও অজানা নয়। বরং কে কত উচ্চস্বরে বাজাতে পারে সর্বত্র যেন তারই প্রতিযোগিতা চলে। এখানেও তাই হয়েছিল। এত জোরে গান বাজানো হচ্ছিল যে, ফ্লাটের জানালা ও মেঝে কাঁপছিল। এ ফ্লাটের বাসিন্দা নাজিমুল হক হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। সেই উচ্চ আওয়াজের অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে তার পুত্র নাসিমুল হক কিছুটা আপত্তি জানিয়েছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিবাহবাড়ির লোকজন নাসিমুল হকের উপর চড়াও হয়। অসুস্থ পিতা নাজিমুল হক ঠেকাতে গেলে তারা তাকেও মারধর করে। একপর্যায়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। (দৈনিক প্রথম আলো ২০-০১-২০১৮)

লাগামহীন ইচ্ছাপূরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতে এভাবে যে কত মানুষ আকস্মিকভাবে বা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়, কে তার হিসাব রাখে?

উচ্চ আওয়াজে গান ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ইচ্ছা আজকালকার তরুণ-তরুণীরা নানা উপলক্ষেই পূরণ করে থাকে, যেমন জন্মবার্ষিকী ও বিবাহবার্ষিকী পালন, ঈদ উদ্‌যাপন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসপালন প্রভৃতি। এসব দিবসে যে উচ্চগ্রামে ঢোল-বাদ্য বাজানো হয়ে থাকে, শান্তিকামী মানুষের পক্ষে তাকে অত্যাচার বললে বোধ হয় কমই বলা হবে। নিরীহ জনগণ সে অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য। কারণ যারা এসব করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিণাম কী হয়, গোপীবাগের আর. কে. মিশন রোডে তা চাক্ষুস করা গেছে।

যার যত ক্ষমতা তার ইচ্ছাপূরণের বিপত্তিও তত বেশি। ক্ষমতাধরেরা তাদের ইচ্ছা পূরণ করে নানামাত্রায়। অর্থবল, লোকবল সব তাদের হাতের মুঠোয়। যখন যে ইচ্ছা জাগে, অমনি তা পূরণের ব্যবস্থা নেয়। সেজন্য অর্থ খরচ করে ও লোকবল ব্যবহার করে। যদি থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, তাও অসংকোচে ব্যবহৃত হয়। সংকোচ ও লাজ-লজ্জার বালাই না রেখে কোন্ ইচ্ছা তারা পূরণ না করছে? তার দায় ও খেসারত বহনের জন্যে নিরীহ জনগণ তো আছেই। হ্যাঁ, নিরীহ জনগণ তাদের ইচ্ছাপূরণের খেসারত দিচ্ছে জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে, যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক থেকে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শিকেয় তুলে, ভ্যাট-করের ক্রমবর্ধমান অংকের ভার মাথায় নিয়ে, নানারকম দূষণের কবলে পড়ে শরীর-মনকে জরাজীর্ণ করে এবং আরও কত মাত্রায়। বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, আমজনতার যত দুঃখ-কষ্ট তার সিংহভাগই সরকারি-বেসরকারি ক্ষমতাধরদের ইচ্ছাপূরণেরই খেসারত। যতদিন না তাদের ইচ্ছাপূরণের প্রতিযোগিতা প্রশমিত হবে, সাধারণ জনগণের ততদিন এ খেসারত দিয়েই যেতে হবে।

আল্লাহর ভয় যাদের নেই, কিংবা বলি মসজিদ-মাদরাসা, দা'ওয়াত-খানকাহ প্রভৃতি দ্বীনী পরিমণ্ডল ও কর্মতৎপরতার সাথে যাদের সংশ্লিষ্টতা নেই, তাদের ইচ্ছাপূরণের দৌড়ঝাঁপ যে লাগামহীন হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বীনের লেবেল যেখানে আছে, সেখানে যদি একের ইচ্ছাপূরণ অন্যের পক্ষে অত্যাচারে রূপ নেয়, নিঃসন্দেহে তা অতি বড় আক্ষেপের বিষয়। যে হাদীস সামনে রেখে আমরা আলোচনা শুরু করেছি তা যখন নামাযের মত মহান ইবাদতেও আপন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার সবক দেয়, তখন অন্যসব দ্বীনী ক্ষেত্রেও যে ইচ্ছার প্রয়োগে সাবধানী হতে হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই সাবধানতা যে যথেষ্ট অবলম্বন করা হচ্ছে, তা কি শক্ত করে বলা যাবে?

ইচ্ছা হল একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করব। অমনি নেমে পড়লাম। মনে চাইল একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করি। ব্যস কাজ শুরু করে দিলাম। চিন্তা করলাম না এখানে মসজিদ বা মাদরাসার আদৌ প্রয়োজন আছে কি নেই। আগে থেকেই যে মসজিদ ও মাদরাসা এখানে আছে, তা দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে কি না? তার পাশেই নতুন একটি প্রতিষ্ঠান চালু করলে পুরনোটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না? কিংবা একটির বর্তমানে বিনা প্রয়োজনে আরেকটির প্রতিষ্ঠা এলাকার মানুষের ভেতর বিভক্তি সৃষ্টির কারণ হবে কি না? মোটকথা কোনওকিছুই ভাবা হয় না। ইচ্ছা যেহেতু জেগেছে পূরণ তা করতেই হবে। দেখা গেছে কোনও মাদরাসার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা হয়েছে দাওরায়ে হাদীস খুলতে হবে। অমনি খুলে দিল। এর জন্যে ছাত্র, উস্‌তায, কিতাব এবং অবকাঠামোগত কোনও প্রস্তুতি নেই। উল্টো খুলে দেওয়ার পর এতদিন যেসব জামাত মোটামুটি চলছিল, তার উপরও মন্দ আছর পড়ল। তো এই ইচ্ছাপূরণ দ্বারা সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ছাড়া লাভ কী হল? তা লাভ কিছু নাই হোক, ইচ্ছা তো পূরণ হল!

এরূপ শখের ইচ্ছা পূরণের বাসনায় অনেকে কলম নিয়ে বসে যায়। বই লেখার সাধ জেগেছে, কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজনীয় পড়াশোনা নেই। না আছে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, না ভাষায় দখল। ব্যস একটা কিছু লিখে বাজারে ছেড়ে দেয়। বাজারে এ জাতীয় বই বিস্তর পাওয়া যায়। কোনও কোনও বই রীতিমত বিভ্রান্তিকর। ইচ্ছাপূরণের তাগিদে এমন বই-ই লিখে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে, যা পড়ে মানুষের উপকার তো কিছু হয়ইনি; উল্টো জানা বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, মানুষের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিয়েছে এবং দ্বীনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে নতুন ফিতনা।

দ্বীনকেন্দ্রিক ইচ্ছাপূরণের আছে বহুমুখী কসরত। একজন দ্বীনদার এবং দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক তো আমরা নিজেকে মনে করিই। সেই সুবাদে নানারকম কাজের ইচ্ছা জাগে। কখনও তাবলীগ জামাতে যেতে ইচ্ছা হয়, কখনও পীর সাহেবের খানকায় বসতে মনে চায়, কখনও ওয়াজ-নসীহত করার তাগাদা বোধ হয়, কখনও ইসলামী দল গঠনের সাধ জাগে, কখনও বা আঘাত হেনে সবকিছু তছনছ করে দিতে অনুপ্রাণিত হই। আগপাছ চিন্তা করি না। পরিপার্শ্ব লক্ষ রাখি না। যুগ ও কালের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করি না। এমনকি নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতাও পরিমাপ করি না। ইচ্ছা জেগেছে আর অন্ধের মত তা পূরণে লেগে পড়েছি। বলাই বাহুল্য এরকম হঠকারি তৎপরতা কখনও সুফল বয়ে আনে না। না অন্যের পক্ষে, না নিজের পক্ষে।

অবস্থার শারয়ী দাবির প্রতি লক্ষ না করে কোনও পীর সাহেবের খানকায় বসে বা চিল্লায় গিয়ে ব্যবসা ধ্বংস করেছে ও পরিবারকে পথে বসিয়েছে, এরও নজির আছে। কাজ তো নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু যে-কোনও ভালো কাজও সুচিন্তিতভাবে ও বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শে করাই বাঞ্ছনীয়।

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রা. চাইলেন সবটা সম্পদ দান করে দেওয়ার অছিয়ত করবেন। এটা যে এক মহতী ইচ্ছা তাতে কার সন্দেহ থাকতে পারে? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইচ্ছা পূরণ করতে দিলেন না। তিনি বললেন, তাহলে অর্ধেকের অছিয়ত করি? তাও নিষেধ করলেন। শেষে বললেন, তিন ভাগের একভাগ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিন ভাগের একভাগ? তাও তো বেশিই। তবুও তিনি এটা অনুমোদন করলেন। সেইসংগে বললেন, তোমার ওয়ারিছগণ মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে, তারচে' বরং তাদের জন্যে কিছু সম্পদ রেখে যাওয়াই শ্রেয়।

এ হাদীসও শিক্ষা দেয় দ্বীনী কাজও কেবল ইচ্ছাবশেই করতে যাওয়া সমীচীন নয়। তা করতে হবে সুচিন্তিতভাবে। আল্লাহর পথে খরচ করা, খানকায় বসে আত্মশুদ্ধির সাধনায় লিপ্ত হওয়া, চিল্লায় গিয়ে দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করা সবই উত্তম কাজ এবং অনেক বড় ছওয়াবের কাজ। কিন্তু এ ছওয়াবের কাজ পরিপার্শ্ব মাথায় রেখেই করা কর্তব্য। নয়তো ছওয়াবের পাশাপাশি অন্যের হক নষ্ট করার গুনাহও হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এটাও অসম্ভব নয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে ছওয়াবের চেয়ে গুনাহের পাল্লাই ভারী হবে।

সুচিন্তিতভাবে না করলে দ্বীনী কাজে অবতীর্ণ হয়েও যে ছওয়াবের চেয়ে গুনাহের পাল্লা ভারী হওয়ার আশংকা থাকে, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় কোনও কোনও ওয়াজ-মাহফিলের দ্বারা।

সেসব ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজকদের ইচ্ছা দূর-দূরান্তের মানুষ দ্বীনের আলোচনা শুনতে পাক। ঘরে ঘরে মহিলাগণও বক্তার বক্তব্য শুনে উপকৃত হোক। এই সাধু উদ্দেশ্যে প্যান্ডেলের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত সাউন্ডবক্স বা হর্ণ লাগিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য মহতই বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বাইরের কতজন লোক মনোযোগ দিয়ে ওয়াজ শোনে? যদি কোথাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক তা শোনে বলে প্রমাণিতও হয়, তবুও মাইকের উচ্চ আওয়াজে গোটা এলাকার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলা, শিশু ও বৃদ্ধদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো, অসুস্থ ব্যক্তির বিশ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌র-আযকারে মনোযোগকে বাধাগ্রস্ত করা এবং শব্দদূষণ দ্বারা এলাকার শান্ত-স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করার বৈধতা শরী'আত আদৌ দেয় কি? তা যে দেয় না সে কথা আয়োজকদের না বোঝার কোনও কারণ নেই। তবুও ইচ্ছাপূরণ বলতে কথা! সাধের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে তারা এলাকার শত-শত মানুষের শান্তি নষ্ট করছে, কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ও তাদের নানাবিধ ক্ষতি সাধন করছে। যেহেতু মূল কাজটা দ্বীনী, তাই মানুষ এসব অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে। মুখ খুলছে না এই ভয়ে যে, পাছে দ্বীনী কাজে বাধা দেওয়ার জন্যে গুনাহগার হতে হয় কিংবা তাকে দ্বীনী কাজের বিরোধী গণ্য করা হয়। সেদিক থেকে এ জাতীয় ইচ্ছাপূরণ দ্বীনের প্রতি মানুষের কোমল অনুভূতির সুযোগ গ্রহণের নামান্তর।

প্রকৃতপক্ষে কোনও কাজের ইচ্ছা হওয়ামাত্র তাতে লেগে পড়া এবং পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় না রাখা একরকম মানসিক দুর্বলতা। একে ইন্দ্রিয়পরবশতাও বলা যায়। শিশুর যেমন কোনওকিছু খাওয়ার সাধ জাগে আর শত বাধা সত্ত্বেও সে তা খাবেই, তেমনি যাদের সংযমশক্তির অভাব তারাও মনের যে-কোনও ইচ্ছা পূরণ করবেই, তা পূরণ করাটা তার নিজের ও সমাজের পক্ষে যত ক্ষতিকরই হোক না। দুর্বলচিত্ত লোকের সে ক্ষতির দিকে তাকানোরই অবকাশ হয় না। হাদীসেও ইরশাদ হয়েছে–

اَلْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا.

অক্ষম ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে তার ইচ্ছা-অভিরুচির অনুগামী করে দেয়। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৫৯

এ অক্ষমতা বলতে মানসিক অক্ষমতাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যার নিজ ইচ্ছা-অভিরুচি দমন করার মত ক্ষমতা নেই, সে হালাল-হারাম নির্বিচারে খাবে এবং বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে করবে। এরূপ লোকের মনে কোনও পাপকর্ম করার খাহেশ জন্মালে এবং তা করার সুযোগ হলে করেই ছাড়ে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না প্রকাশ্য পাপের ক্ষেত্রেও। আর পাপকর্মটি যদি হয় অপ্রকাশ্য বা পরোক্ষ, সেদিকে তো তাদের নজরই যাবে না। অর্থাৎ সরাসরি যা করছে তা তো বৈধ কাজ কিংবা হতে পারে দ্বীনী কাজও, কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে যেসব পারিপার্শ্বিকতা দেখা দেয় বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট যেগুলো আঞ্জাম দেওয়া হয়, তা শরী'আত অনুমোদন করে না। এরকম পরোক্ষ বা অপ্রকাশ্য পাপ তারা অবলীলায় করে ফেলবে। বাস্তবিকপক্ষে তাই করা হচ্ছে, যেমনটা আমরা উপরের দৃষ্টান্তসমূহে দেখছি।

যার সংযমশক্তি প্রবল এবং যে ব্যক্তি পরিণামদর্শী, সে কখনও তার ইচ্ছা-অভিরুচির যথেচ্ছ ব্যবহার করবে না। তার মনে যখনই কোনও কাজের ইচ্ছা জাগবে তাতে সংযমশক্তি ব্যবহার করবে। কিছুক্ষণের জন্যে ইচ্ছাটি আটকে রেখে কাজের বৈধাবৈধ চিন্তা করবে। বৈধ বিবেচিত হলে ইচ্ছার বাঁধন খুলে দেবে ও তা বাস্তবায়িত করবে। আর যদি অবৈধ হয়, তবে ইচ্ছা দমন করবে।

মনন ও মানসিকতায় শক্তি সঞ্চার হয় তাকওয়া থেকে। যার আল্লাহভীতি যত বেশি তার মানসিকশক্তি তত প্রবল। সুতরাং মানসিকশক্তি প্রবল করে তোলার জন্যে দরকার তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চর্চা। আল্লাহভীতি এমনই এক দাওয়াই, যা মনে শক্তি যোগায়, শরীরে সজীবতা আনে ও চিন্তা-ভাবনাকে শাণিত করে। আল্লাহ-ভীরু লোকের চিন্তা অতি দূরবিস্তৃত হয়ে থাকে। সামনের সীমিত পরিমণ্ডলে তার দৃষ্টি আটকে থাকে না। তার কাজের স্পর্শ কোথায় কোথায় লাগতে পারে সেদিকেও চোখ বুলায়। সরাসরি বৈধ হলেও পরোক্ষ কী কী অবৈধতা সে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, তাও সে বিবেচনা করে। আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও কোনও গুপ্ত মন্দত্ব তার ভেতর আছে কি না খতিয়ে দেখে। এককথায় সে ইচ্ছাপূরণসর্বস্ব হয় না। সে হয় সদ্বিবেচক ও পরিণামদর্শী।

মোটকথা উপরিউক্ত হাদীস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের কর্তব্য জীবনের অন্যান্য কাজেও নিজ ইচ্ছাপূরণে সাবধানী হওয়া।

প্রথমত চিন্তা করতে হবে, যে কাজের ইচ্ছা হয়েছে সে কাজটি শরী'আতসম্মত কি না। দ্বিতীয়ত ভাবতে হবে কাজের পদ্ধতি নিয়ে। কোন্ পদ্ধতিতে করলে তা দ্বারা অন্য লোক কষ্ট পাবে না বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সেই পদ্ধতি খুঁজে নিতে হবে। যে সকল পন্থা অন্যদের পক্ষে পীড়াদায়ক তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে, তাতে সেসব পন্থা অবলম্বনের ইচ্ছা যতই প্রবল হোক না কেন। মনে রাখতে হবে, নিজ ইচ্ছাপূরণের নাম দ্বীনদারী নয়। দ্বীনদারী বলে শরী'আতের অনুসরণকে। অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজ ইচ্ছা পূরণের অনুমতি শরী'আত দেয় না। এরকম ইচ্ছা দমন করা অবশ্যকর্তব্য। তা দমনের জন্য যে মানসিক শক্তির দরকার, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চর্চা দ্বারা তা সহজেই অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুত্তাকী হয়ে ওঠার তাওফীক দান করুন– আমীন। ●

আমাদের দ্বীনের রুচি ও বৈশিষ্ট্য

মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রাহ.

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী ও বর্ধনশীল বস্তুরই আছে নিজস্ব রূপ-গুণ, আকৃতি-প্রকৃতি। এই আকৃতি-প্রকৃতি দ্বারাই গঠিত হয় ঐ বস্তুর সত্তা এবং এই রূপ-গুণই বস্তুটিকে আলাদা করে অন্য সকল বস্তু থেকে। এই কথা যেমন প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য ব্যক্তি ও সমাজ, জাতি ও সম্প্রদায় এবং ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেও। এই সকল কিছুরই এমন কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য লক্ষণ রয়েছে, যা এদেরকে সকলের কাছে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে।

এখন দ্বীন-ইসলাম, যা কামিল দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা; এর বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো কী তা জানার ও বোঝার কৌতুহল নিতান্তই স্বাভাবিক এবং এই অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকারও একজনের রয়েছে।

দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে এবং এর শিক্ষা ও নির্দেশনা, নীতি ও বিধানের বিশদ অধ্যয়নের আগে আমাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে হবে। কারণ, দ্বীনের পূর্ণ সুফল পাওয়ার এবং নিজেকে এর রঙে রাঙিয়ে তোলার এটিই স্বাভাবিক উপায়।

সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে, এই দ্বীন আমরা কাদের সূত্রে লাভ করেছি। চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সূত্রে? আইনবিদ বা আচরণবিদগণের সূত্রে? মনোবিজ্ঞানী কিংবা কল্পনার অশ্ব ধাবনকারী দার্শনিকগণের সূত্রে? দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কিংবা ভাগ্যান্বেষী রাজনীতিকদের সূত্রে? না; এদের কারো মাধ্যমেই এই দ্বীন আমাদের কাছে আসেনি। এই দ্বীন আমরা পেয়েছি ঐ মহান আম্বিয়ায়ে কেরামের সূত্রে, যাঁদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহী আসত এবং যাঁদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটেছে খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের মাধ্যমে।

এই দ্বীন সম্পর্কেই বিদায় হজ্বে আরাফার দিন নাযিল হয়েছে এই আয়াত–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিআমত পরিপূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই পছন্দ করলাম। –সূরা মায়েদা (৫) : ৩

আর এই দ্বীনের রাসূল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

তিনি প্রবৃত্তির প্রেরণা থেকে কথা বলেন না; এ (কুরআন) তো ওহী, যা (তাঁর কাছে) পাঠানো হয়। –সূরা নাজ্‌ম (৫৩) : ৩-৪

এই দ্বীনের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আকীদার গুরুত্ব এবং সবার আগে এই বিষয়টির নিষ্পত্তির তাকীদ। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী এক নির্দিষ্ট আকীদার দাওয়াত দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোনো প্রকারের শৈথিল্য বা সমঝোতায় তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। এই আকীদা গ্রহণের আগ পর্যন্ত অন্য সব কিছু তাঁদের কাছে অসার ও প্রাণহীন বলে সাব্যস্ত হত। কোনো উন্নত থেকে উন্নততর জীবন, উচ্চ থেকে উচ্চতর মানবিক গুণাবলীর অধিকারী কোনো ব্যক্তি, সেবা ও সততার ভারসাম্য ও যথার্থতার কোনো জীবন্ত প্রতিমূর্তি, তার দ্বারা কোনো কল্যাণ-রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলেও, কোনো সৎ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও কিংবা কোনো কল্যাণকর বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটলেও– ঐ পর্যন্ত তাঁদের কাছে যথার্থ গ্রহণীয় হত না, যে পর্যন্ত ঐ আকীদা ও বিশ্বাসকে গ্রহণ না করা হয়, যা তাঁরা নিয়ে এসেছেন এবং যে পর্যন্ত এইসব উত্তম চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়।

এই হচ্ছে সেই সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা, যা আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত আর রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক নেতা এবং সংস্কার ও বিপ্লবের ঐ সকল নায়কদের কর্ম ও আহ্বানকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়, যাদের চিন্তা ও দর্শনের উৎস আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও জীবনাদর্শের স্থলে অন্য কিছু।১

ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের অনেক প্রমাণ আছে কুরআন মাজীদে এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে। কুরআন মাজীদ হচ্ছে সকল প্রকারের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত একমাত্র আসমানী কিতাব, যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তদ্রূপ আম্বিয়ায়ে কেরামের সীরাতসমূহের মাঝে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতই হচ্ছে একমাত্র জীবনচরিত, যা একাডেমিক ও ঐতিহাসিক সকল বিচারে নির্ভরযোগ্য এবং সকল যুগে অনুসরণযোগ্য।

তো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দ্বীন-ইসলামের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যটির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আ. ও তাঁর অনুসারীদের অবস্থান। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীল হযরত ইবরাহীম আ.-এর সহিষ্ণুতা ও হৃদয়ের কোমলতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন–

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ.

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু, কোমলহৃদয় ও আল্লাহ-অভিমুখী। –সূরা হূদ (১১) : ৭৫

আর আকীদার বিষয়ে তাঁর ও তাঁর সঙ্গী-অনুসারীদের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَاۤ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

তোমাদের (অবশ্যকর্তব্য) ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের অনুসরণ, যাঁরা আপন কওমের লোকদের বলেছিল, তোমাদের সাথে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা-অর্চনা কর সেসবের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আর যতদিন

১. বর্তমানকালের অবক্ষয়-অধঃপতনে বিরক্ত অনেকের মাঝেই এই প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা কাউকে কোনো বিপ্লবের শ্লোগান দিতে দেখলে বা কোনো বড় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে দেখলে আর কিছুরই প্রয়োজন বোধ করে না, তার আকীদা-বিশ্বাসের সকল বিচ্যুতি এবং চিন্তা-ভাবনার সকল বিভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয় এবং আকীদার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বসে। শুধু তা-ই নয়, যারা এক্ষেত্রে আকীদার প্রশ্ন তোলেন তাদেরকে নিন্দা-সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করে, এমনকি অনেক সময় বাতিল শক্তির সাথে যোগ-সাজশের অপবাদও আরোপ করে। এই প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বীনের সহীহ মেযাজের পরিপন্থী এবং নবীদের অনুসৃত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

তোমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর ঈমান না আন ততদিনের জন্য তোমাদের ও আমাদের মাঝে রইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ। তবে ইবরাহীম তার কাফির পিতাকে বলেছিল, আল্লাহর কাছে আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করব।[২] আল্লাহর কাছে আমি আপনার সম্পর্কে কোনো ক্ষমতাই রাখি না।

হে আমাদের রব! আমরা তোমারই উপর ভরসা রাখি এবং তোমার দিকেই ফিরি আর তোমার কাছেই তো ফিরে যেতে হবে আমাদের। –সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ৪

আকীদার গুরুত্ব ও তা শত্রুতা-মিত্রতার মাপকাঠি হওয়ার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, সূরা কাফিরূনের মতো সূরা মক্কা মুকাররমায় ঐ পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, যখন পরিস্থিতির দাবি ছিল, ছাড় ও সমঝোতার এবং ইবাদত-আকীদার ভিত্তিতে শত্রুতা সৃষ্টি না করার। যতদিন ইসলামের শক্তি সুসংহত না হয়েছে অন্তত ততদিনের জন্য বিষয়টি মুলতবি রাখার। কিন্তু সেই প্রতিকূল পরিবেশেও কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খোলাখুলি ঘোষণা দিচ্ছেন–

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ، لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ، وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ، وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ، لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

(হে নবী! ইসলামের মুনকিরদের) বলুন, হে কাফিরেরা! তোমরা যাদের (যে সমস্ত প্রতিমার) উপাসনা কর আমি তাদের উপাসনা করি না আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না। আবারও বলছি, তোমরা যাদের উপাসনা কর আমি তাদের উপাসক নই। আর না তোমরা তাঁর উপাসক যাঁর বন্দেগী আমি করি। তোমরা তোমাদের দ্বীনে আর আমি আমার দ্বীনে। –সূরা কাফিরূন (১০৯)

কারো বেলায় যদি ঈমান ও আকীদার বিষয়টি উপেক্ষা করার মতো হত তাহলে এর উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব। জীবনভর তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আড়াল করে রেখেছেন। সীরাতকারগণ একবাক্যে লেখেন, আমৃত্যু আবু তালেব ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঢাল ও দুর্গ সদৃশ। নিজ গোত্র ও কওমের বিরুদ্ধে আজীবন তিনি ছিলেন তাঁর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। এ সত্ত্বেও সহীহ রেওয়ায়েতে আছে, আবু তালিবের ইন্তিকালের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কাছে গেলেন তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ বিন আবু উমাইয়াও সেখানে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালিবকে বললেন, চাচা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। আমি আল্লাহর কাছে আপনার কালেমা পাঠের সাক্ষ্য দিব। একথা শুনে আবু জাহল ও ইবনে আবী উমাইয়া বলে উঠল, আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? অবশেষে আবু তালিব এই বলে মৃত্যুবরণ করল যে, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই রইলাম। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৬০

সহীহ হাদীসে আছে, একবার হযরত আব্বাস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, আবু তালিব তো আপনার হেফাযত করতেন, আপনাকে সাহায্য করতেন, আপনার প্রতি তার মনে খুবই পক্ষপাত ছিল, যে কারণে আপনার ব্যাপারে তিনি কারো সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরোয়া করতেন না। এসব কি তার কোনো কাজে আসবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাকে পেয়েছিলাম অগ্নি-গর্ভে। সেখান থেকে তুলে এনেছি মামুলী আগুনে। –সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান হাদীস ২০৯

ইমাম মুসলিম রাহ. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আল্লাহর রাসূল! জাহেলী যুগে ইবনে জুদআন আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করত, গরীব মিসকীনদের খাবার খাওয়াত, এই সব কাজ তার কোনো উপকারে আসবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, না, এসবে তার কোনো উপকার হবে না; কারণ সে কখনো বলেনি–

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

পরওয়ারদেগার! কিয়ামতের দিন আমার গোনাহ-খাতা মাফ করে দিও! –সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ২১৪

এর চেয়েও স্পষ্ট আরেকটি ঘটনা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। হাররাতুল ওবারা নামক স্থানে পৌছলে এক লোক তাঁর কাছে হাজির হল। লোকটি বাহাদুরী ও সাহসিকতায় তৎকালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম আনন্দিত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, এর দ্বারা মুসলিম বাহিনীতে খুব মূল্যবান একটি সংযোজন হল। কেননা, সেই জিহাদে সাহাবীদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ তেরজন। সাধারণ একজন লোকের সংযোজনও তখন অতি মূল্যবান ছিল। সেখানে এমন একজন অভিজ্ঞ সৈনিকের আগমন। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমি আপনার সাথে এই অভিযানে যেতে চাই এবং গনীমতে শরীক হতে চাই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখ? সে বলল, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফিরে যাও। আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে পারি না। হযরত আয়েশা রা. বলেন, সে কিছু দূর চলে গেল। আমরা যখন শাজারা নামক স্থানে পৌছলাম সে আবার এল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পূর্বের প্রস্তাব পেশ করল। তিনিও পূর্বের মতোই উত্তর দিলেন। সে চলে গেল। আমরা বাইদা নামক স্থানে পৌছলে সে আবার এল। আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনছ? এবার সে বলল, জী হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আমাদের সাথে যেতে পার। –সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস ১৮১৭

* * *

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের (যাঁদের প্রধানতম হচ্ছেন খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাওয়াত ও তাবলীগ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি। এটিই তাঁদের সকল কর্মের মূল প্রেরণা।

এই প্রেরণা এমন এক ধারালো তরবারি, যা এই উন্নত লক্ষ্য ছাড়া আর সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কারো মধ্যে এই প্রেরণা জেগে ওঠার পর না থাকে ধন-সম্পদের লোভ, না ভোগ-বিলাসের চাহিদা, না রাজ্য ও ক্ষমতার লিপ্সা আর না পদ-পদবীর মোহ। এমনকি তখন ক্রোধ ও প্রতিশোধপরায়ণতা এবং জাহেলী দম্ভ-অহংকারও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার কর্ম-তৎপরতা ও সংগ্রাম-সাধনায় এসবের কোনো কিছুই আর প্রভাবক হয় না।

---

২. কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম আ. মূর্তিপূজক পিতার জন্য দুআ ও ইস্তিগফারের ওয়াদা কেন করেছিলেন। সূরা বারাআতের ১১৩-১১৪ নং আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব আছে। আর তা হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম এই ওয়াদা অনুযায়ী ইস্তিগফার করেছেন বটে কিন্তু যখন কুফরির হালতে বাবার মৃত্যুর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার প্রতি বিমুখ হয়ে যান এবং তার সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেন। এখন এটিই চিরন্তন নীতি।

এই একনিষ্ঠ আল্লাহমুখিতার উদ্ভাসিত প্রকাশ দেখা যায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ দুআয়, যা তিনি তায়েফ থেকে ফেরার সময় করেছিলেন। তায়েফবাসী তাঁর সাথে এমন নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করেছিল, যার নজির দাওয়াত ও নবুওতের ইতিহাসে মেলা কঠিন। যে মহান লক্ষ্য ও প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন তা (বাহ্যত) পূরণ হয়নি। তায়েফের একটি লোকও সেদিন ইসলাম কবুল করেনি। এই কঠিন মুহূর্তে ও নাজুক মানসিক অবস্থায় রাব্বুল আলামীনের দরবারে যে প্রার্থনা বাক্যগুলো তাঁর যবানে মুবারক থেকে উৎসারিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي.

আয় আল্লাহ! তোমার কাছেই অভিযোগ আমার দুর্বলতার ও উপায়হীনতার এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার। হে সকল রহমকারীর শ্রেষ্ঠ রহমকারী! তুমিই তো দুর্বলজনের প্রভু। আর তুমিই আমার প্রভু। কার হাতে আমাকে সোর্পদ করছ; কোনো অনাত্মীয় রুদ্রমূর্তির হাতে? নাকি কোনো দুশমনকে আমার কর্তা বানিয়ে দিচ্ছ?...

এর পরের বাক্যে দেখা যায় ঐ নবী-স্বভাবের পূর্ণ-বিকশিত রূপ, যার তরবিয়ত হয়েছিল কুদরতের হাতে। তিনি আরয করলেন–

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي.

তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক তবে আমিও এর কোনো পরোয়া করি না। তবে তোমার পক্ষ হতে আফিয়াতই আমার জন্য অধিক প্রশস্ত।... (যাদুল মা'আদ ১/৩০২; আসসীরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে কাছীর ২/১৫০)

আরেক 'উলুল আযম' নবী হযরত নূহ আ.-এর অবস্থা দেখুন। তাঁর সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সাক্ষ্য–

فَلَبِثَ فِیْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِیْنَ عَامًا.

তিনি ওদের মাঝে অবস্থান করেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর। –সূরা আনকাবুত (২৯) : ১৪

এই দীর্ঘ সময় তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে একনিষ্ঠভাবে মশগুল থেকেছেন এবং সমকালীন মানুষদের বোঝাবার সঙ্গত সকল উপায় অবলম্বন করেছেন। কুরআন মাজীদে তাঁর এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّنَهَارًا.

তিনি আরয করলেন, আয় পরওয়ারদেগার! আমি আমার কওমকে রাতদিন ডেকেছি। –সূরা নূহ (৭১) : ৫

আরো বলেন–

ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا.

আমি তাদের খোলাখুলি আহ্বান করেছি এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাদের বুঝিয়েছি। –সূরা নূহ (৭১) : ৮-৯

কিন্তু এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফল কী হয়েছিল?

ইরশাদ হয়েছে–

وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِیْلٌ.

অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান আনে। –সূরা হূদ : (১১) ৪০

কিন্তু এ কারণে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে কোনোরূপ অভিযোগ করতে কিংবা ভগ্নোৎসাহ হতে দেখা যায়নি। তিনি এই কঠিন পরিশ্রমকে ব্যর্থ বলেও মনে করেননি। আর না আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে, না তাঁর উলুল আযম নবী হওয়ার মধ্যে হেরফের ঘটেছে। বরং আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আল্লাহর পয়গাম বান্দাদের মাঝে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর রাহে চেষ্টা-প্রচেষ্টার হক্ব আদায় করেছিলেন। পুরস্কাররূপে তিনি পেয়েছেন এই মর্যাদা–

وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ سَلٰمٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعٰلَمِیْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ.

আর তাঁর (সপ্রশংস) আলোচনা পরবর্তীদের মাঝে বাকি রেখেছি। সালাম নূহের উপর সারা জাহানে। এভাবেই আমি বদলা দিয়ে থাকি সৎকর্মশীলদের। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম। –সূরা সাফফাত (৩৭) : ৭৮-৮১

দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দ্বীনী কর্মতৎপরতায় যারা যুক্ত, কুরআন তাদের এই রীতি ও আদব শেখায়–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ.

সেই আখিরাতের ঘর, আমি তাদের জন্যই রাখব, যারা পৃথিবীতে অহংকার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিপ্রায় পোষণ করে না। আর উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই। –সূরা কাসাস (২৮) : ৮৩

তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর হুকুম-আহকামের বাস্তবায়নের জন্য, দাওয়াত ও জিহাদের পথের বাধা-বিঘ্ন অপসারণের জন্য এবং পৃথিবী থেকে অন্যায়-অনাচার দূর করে আদর্শ ইসলামী জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে উপায়-উপকরণ ও ক্ষমতা-সক্ষমতার প্রয়োজন তা অর্জনের চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-চরিত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। এই মানসিকতা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই চিন্তা তো অনৈসলামিক চিন্তা। এ তো সেই সন্ন্যাসবাদেরই ছায়া, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। আল্লাহ তাআলা তো তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْـًٔا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা– অতি অবশ্যই তিনি তাদের পৃথিবীতে শাসন-ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন। আর তাদের জন্য যে দ্বীনকে তিনি পছন্দ করেছেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন এবং ভীতির পর তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফর করবে ওরাই তো ফাসিক, সত্যত্যাগী। –সূরা নূর (২৪) : ৫৫

আরো ইরশাদ–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّیَكُوْنَ الدِّیْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ.

ওদের সাথে লড়তে থাকবে যতদিন খতম না হয় ফিৎনা (কুফুরির অরাজকতা) আর দ্বীন সর্বতোভাবে না হয় শুধু আল্লাহর। –সূরা আনফাল (৮) : ৩৯

আরো ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

এরা ঐ সকল মানুষ, যাদেরকে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে আর সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই কব্জায়। –সূরা হজ্ব (২২) : ৪১

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে তবে তা এই এই শর্তে যে, তাদেরকে ঈমানী গুণে গুণান্বিত হতে হবে আর তাদের সকল কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

হতে হবে। কারণ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তো উদ্দেশ্য নয়, বরং তা কাজের ফলাফল। তা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, ইনাম ও পুরস্কার।

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

দেখ, তোমরা হতবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমরা যদি (সত্যই) মুমিন হও তবে বিজয় তোমাদেরই। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৯

কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বান্দার কাছে আল্লাহর যা কাম্য এবং যা আল্লাহর কাছে বান্দার কাজে আসবে তা হচ্ছে কলবে সালীম– নিরোগ নিষ্কলুষ অন্তর। ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

যেদিন না ধন-সম্পদ কোনো উপকারে আসবে, না সন্তান-সন্ততি। তবে যে আল্লাহর কাছে পাকসাফ অন্তর নিয়ে এসেছে (সে বাঁচতে পারবে)। –সূরা শুআরা (২৬) : ৮৮-৮৯

হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রশংসায় আল্লাহ তাআলার ইরশাদ–

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

যখন তিনি এলেন তাঁর রবের কাছে নির্দোষ অন্তর নিয়ে। –সূরা সাফফাত (৩৭) : ৮৪

একারণে যা কিছু অন্তরকে কলুষিত করে, যা কিছু প্রতিমা ও উপাস্যে পরিণত হওয়ার ও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ভালবাসায় শরীক–অংশী হওয়ার আশঙ্কা জাগে সেইসব কিছু সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে এবং যে কোনো মূল্যে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ.

ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করেছেন, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। –সূরা ফুরকান (২৫) : ৪৩

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ–

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

শয়তান বনী আদমের (শিরা-উপশিরায়) রক্তের মতো প্রবাহিত হয়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৭৫

* * *

এই দ্বীনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের আনীত দ্বীন ও শরীয়ত এবং দাওয়াত ও পয়গাম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল হয়ে থাকেন। তাঁরা কোনো অবস্থাতেই, এমনকি তাঁদের দাওয়াত ও মিশনের সাফল্যের খাতিরেও তাতে কোনোরূপ 'সংস্কার' ও পরিবর্তন অনুমোদন করেননি। তাঁদের কাছে শৈথিল্য ও অবস্থান বদলের কোনো সুযোগ নেই। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের ইরশাদ–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হুকুম আপনি পেয়েছেন তা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিন। আর মুশরিকদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। –সূরা হিজ্‌র (১৫) : ৯৪

আরো ইরশাদ–

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

হে রাসূল! আপনার রবের তরফ থেকে যা কিছু আপনার ওপর নাযিল হয়েছে তা সব পৌঁছে দিন। যদি এরূপ না করেন তবে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ত্রুটি করলেন। আর আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের অনিষ্ট থেকে। –সূরা মায়িদা (৫) : ৬৭

আরো ইরশাদ করেন–

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.

এরা চায় তুমি যদি নরম হও ওরাও নরম হবে। –সূরা কলম (৬৮) : ৯

ইসলামের তাওহীদ ও সকল বুনিয়াদী আকীদার ক্ষেত্রে, এমনকি দ্বীনের আরকান ও ফরযসমূহের ব্যাপারেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কোনোরূপ আপস ও খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা ছিল না, যা কিনা সর্বকালের ও সর্বযুগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য; নিজেদের যারা মনে করে থাকে বাস্তববাদী ও কাজের মানুষ।

একটি দৃষ্টান্ত : তায়েফ বিজয়ের পর ছকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হল। এই গোত্রটি ছিল কুরাইশের পর আরবের সবচেয়ে মর্যাদাশালী ও প্রভাবশালী গোত্র। এদের আবেদন ছিল, এদের 'লাত' দেবীকে যেন তিন বছরের জন্য পূর্বের অবস্থায় রাখা অনুমোদন করা হয়। অন্তত এই প্রতিমাটির সাথে যেন অন্যান্য প্রতিমার মতো আচরণ না করা হয়। কারণ এর কারণেই তায়েফ ছিল মক্কার পর জাহেলী আরবের দ্বিতীয় তীর্থভূমি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার 'না' করে দিলেন। প্রতিনিধিদল দুই বছরের, এরপর অন্তত এক বছরের অবকাশ চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ও নাকচ করে দিলেন। অবশেষে তারা এইটুকুতে নেমে আসল যে, আমাদের তায়েফ ফিরে যাওয়ার পর মাত্র এক মাসের অবকাশ দিন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শেষ আবেদনও শুধু নাকচই করলেন না হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (তায়েফে যার আত্মীয়তা ছিল) ও বনু ছাকীফ গোত্রের এক সদস্য মুগীরা ইবনে শো'বাকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন তায়েফে গিয়ে লাত প্রতিমা ও এর মন্দিরটি ধুলিস্যাৎ করে দেন।

দলটি এ আবেদনও করেছিল যে, তাদের জন্য নামাযের হুকুম যেন মাফ করে দেয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছেন, 'যে দ্বীনে সালাত নেই তাতে কোনো মঙ্গল নেই।'

আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দলটি তায়েফে ফিরে গেল। হযরত আবু সুফিয়ান ও মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-ও গেলেন এবং লাত-মন্দির ধুলিস্যাৎ করে দিলেন। ছাকীফ গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং গোটা তায়েফ ইসলামের ছায়াতলে এসে গেল। –যাদুল মা'আদ ১/৪৫৮-৪৫৯

আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং বর্ণনা-উপস্থাপনায় ঐ পন্থা ও পরিভাষাই তাঁরা ব্যবহার করেন, যা তাঁদের দাওয়াতের প্রাণসত্তা এবং নবুওতের মেযাজের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁরা খোলাখুলি ও স্পষ্ট ভাষায় আখিরাতের দাওয়াত দেন, জান্নাত ও এর নায-নিআমতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, জাহান্নাম ও এর আযাব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেন, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা তাঁরা এমনভাবে করেন, যেন সবকিছু তাঁদের চোখের সামনে। তাঁরা নিছক যুক্তি-বুদ্ধি ও পার্থিব লাভালাভের স্থলে গায়েবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান।

তাঁদের যুগেও ছিল তৎকালীন নানা বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শন। ছিল বিভিন্ন শ্রেণির নিজস্ব পরিভাষা। আম্বিয়ায়ে কেরাম এই সকল পরিভাষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা এ-ও বুঝতেন যে, এই সকল পরিভাষাই এখন এখানকার 'চালু মুদ্রা'। এ সত্ত্বেও মানুষকে ডাকার জন্য ও নিজের দিকে ভেড়াবার জন্য সেসব পরিভাষা তাঁরা ব্যবহার করতেন না। তাঁরা দাওয়াত দিতেন আল্লাহর সকল গুণ ও কর্মসহকারে তাঁর উপর ঈমান আনার, ফিরিশতার উপর, তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনার। তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতেন যে, তাঁদের এই দাওয়াত কবুল করার ও ঈমান আনার পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি।

দাওয়াতের এই নববী পন্থার এক প্রকৃষ্ট

উদাহরণ হচ্ছে আকাবায়ে ছানিয়ার বাইআতের ঘটনা। সে বছর বায়াত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলার একটি দল ইয়াছরিব থেকে হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় আসে। তারা আকাবার অদূরবর্তী উপত্যকায় একত্র হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আব্বাসের সাথে সেখানে তাশরীফ আনেন। তিনি তাদের সামনে কুরআন পাকের আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করলেন। শেষে বললেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গিকার নিতে চাই যে, তোমরা যেভাবে নিজেদের পরিবার-পরিজনকে হেফাযত করে থাক সেভাবেই আমারও হেফাযত করবে। আনসারীরা তাঁর হাতে বাইআত করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেও এই মর্মে অঙ্গিকার নিলেন যে, তিনি তাদের ছেড়ে নিজের কবিলায় ফিরে আসবেন না।

আনসারীগণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই চুক্তির সুদূরপ্রসারী ও বিপদজনক ফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাদের জানা ছিল, এই চুক্তির মাধ্যমে চারপাশের কবিলাগুলোর; বরং সারা আরবের কবিলাগুলোর দুশমনী তাঁরা বরণ করে নিচ্ছেন। তাদের অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক সঙ্গী আব্বাস ইবনে উবাদা আনসারী তাদেরকে ঐ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ও হুঁশিয়ারও করেছিলেন। কিন্তু তারা সকলেই একবাক্যে জবাব দিয়েছেন, আমরা আমাদের ধন-সম্পদের ক্ষতি ও খানদানের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিহত হওয়ার আশঙ্কা কবুল করেই তাঁকে আমাদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি।

এরপর তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে আরয করলেন, আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি এই অঙ্গিকার রক্ষা করে দেখাই তাহলে কী পাব? এই নাজুক পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নের সম্মুখীন যদি আল্লাহর পয়গম্বর ছাড়া অন্য কেউ হত, কোনো জাতীয় নেতা, কিংবা কোনো রাজনীতিক হত তাহলে নিঃসন্দেহে তার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর এই হত যে, অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার স্থলে এখন তোমাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে; একটি মামুলী কবিলার পরিচিতির স্থলে সারা আরবে তোমরা স্বীকৃতি পাবে এবং তোমরা আবির্ভূত হবে একটি শক্তি হিসেবে। বলাবাহুল্য যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটা কোনো দূরকল্পনা ছিল না; বরং সম্ভাব্যতার সমস্ত লক্ষণই পরিস্ফূট ছিল। এই ইয়াছরিববাসীদেরই একজন একটু আগে বলেছিলেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এই অবস্থায় রেখে এসেছি যে, সম্ভবত তাদের মতো অনৈক্য ও বিভেদের শিকার আর কোনো জাতি নেই। আমাদের আশা, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন আমরা তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তাদের সামনে এই দাওয়াত আমরা পেশ করব। যে দ্বীন আমরা গ্রহণ করেছি তাদেরকেও তা গ্রহণে উৎসাহিত করব। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কেন্দ্র করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিলে আপনার চেয়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী আর কেউ হবে না। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪২৯)

কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে যাননি। 'আল্লাহর রাসূল! বিনিময়ে আমরা কী পাব?'– এই জিজ্ঞাসার জবাবে শুধু বলেছেন, 'জান্নাত।' তাঁরা তখন হাত বাড়িয়ে আরয করলেন; 'আল্লাহর রাসূল! অনুগ্রহ করে আপনার হাত বাড়ান।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মোবারক বাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা সকলেই বাইআত হয়ে গেলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪২৯)

এই গায়রত-চেতনা ও নববী দায়িত্ববোধেরই ফল যে, কোনো নবী শরীয়তের কোনো বিধানে কোনোরূপ পরিবর্তন অনুমোদন করেন না, কারো সুপারিশ বা প্রভাবে কোনো বিধানের প্রয়োগাদেশ স্থগিত করতেও প্রস্তুত হন না। কাছের দূরের, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে আল্লাহর আইন ও দণ্ড প্রয়োগ করেন।

বনু মাখযুম গোত্রের জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা একবার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহাস্পদ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. তার পক্ষে সুপারিশ করতে গেলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আল্লাহর নির্ধারিত হদ সম্পর্কে সুপারিশ?! পরে লোকদের একত্র করে ইরশাদ করলেন, লোকেরা! তোমাদের পূর্ববর্তী কওম এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, শরীফ খান্দানের প্রভাবশালী কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হত আর দুর্বল ও সাধারণ কেউ চুরি করলে তার ওপর হদ জারি করা হত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে তারও হাত কাটতে আমি দ্বিধা করব না! –সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, বাবু কাতইস সারিকিস শারীফ ওয়া গাইরিহী ওয়ান নাহ্ঈ আনিশ শাফাআতি ফিল হুদূদ; হাদীস ১৬৮৮

এই চেতনাই স্থানান্তরিত হয়েছে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাহাবী ও উত্তরসূরিদের মাঝেও। তাঁরাও জাগতিক সফলতা-ব্যর্থতা ও উপস্থিত লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে কুরআনের শিক্ষা, শরীয়তের বিধি-বিধান ও ইসলামের রীতি-নীতির হেফাযত করেছেন। জাফনা রাজপরিবারের এক রাজা জাবালা ইবনে আয়হাম গাসসানীর সাথে ফারুকে আজম হযরত ওমর রা.-এর ঐতিহাসিক ঘটনাটি এ বিষয়ের এক মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত।

জাবালা মদীনায় এসেছিল অত্যন্ত জাকজমকের সাথে আক ও গাসসান কবীলার পাঁচ শ লোক নিয়ে। সে যখন মদীনায় প্রবেশ করছিল তখন তার জাঁকজমক ও ঝলমলে পোশাক-পরিচ্ছদ দেখার জন্য মদীনার অন্তপুরবাসীরা পর্যন্ত বের হয়ে এসেছিলেন। হযরত ওমর রা. হজ্বের সফরে রওয়ানা হলে সেও তাঁর সাথে রওয়ানা হল। বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় তার তহবন্দের আঁচল বনু ফাযারার এক লোকের পায়ের নীচে পড়ে গেল এবং টান লেগে খুলে গেল। জাবালা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ঐ লোকটির নাকেমুখে থাপ্পড় বসিয়ে দিল। ফাযারী আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা.-এর কাছে নালিশ করলেন। তিনি জাবালাকে ডেকে পাঠালেন। হাজির হলে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কাজ করেছ? জাবালা বলল, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন! এই লোকটা আমার তহবন্দ খুলে ফেলতে চেয়েছে। আল্লাহর ঘরের মর্যাদা বাধা না হলে এর মাথায় তরবারি চালতাম। হযরত ওমর রা. বললেন, তুমি অপরাধ স্বীকার করেছ। এখন হয় একে সন্তুষ্ট করবে নতুবা আমি এর বদলা নিব। জাবালা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী করবেন? হযরত ওমর বললেন, আমি ঐ ফাযারীকে বলব, সে-ও যেন তোমার নাকেমুখে অনুরূপ থাপ্পড় মারে। জাবালার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! এ কেমন করে হয়! ও এক মামুলী লোক আর আমি নিজ অঞ্চলের অধিপতি! হযরত ওমর রা. বললেন, ইসলাম তাকে ও তোমাকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে। এখন তাকওয়া ও আফিয়াত ছাড়া আর কিছুতেই তুমি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। জাবালা বলল, আমার তো ধারণা ছিল, ইসলাম কবুল করে আমি জাহেলী যুগের চেয়েও বেশি ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হয়েছি! হযরত ওমর রা. বললেন, এই সব রাখ। এখন হয় এর সাথে মিটমাট কর, নয়ত অনুরূপ থাপ্পড়ের জন্য প্রস্তুত হও।

ওমর রা.-এর এই রুদ্রমূর্তি দেখে জাবালা বলল, আমাকে আজ রাতটুকু চিন্তা-ভাবনার সময় দিন। হযরত ওমর রা. তার আবেদন গ্রহণ করলেন। রাত ঘনিয়ে এলে জাবালা

তার উট-ঘোড়া নিয়ে শামের দিকে পালিয়ে গেল। সকালে মক্কায় তার নাম-নিশানাও ছিল না। বহুদিন পর জাবালার দরবার-সঙ্গী জুছামা ইবনে মুসাহিক কিনানীর কাছে জাবালার শাহী ঠাটবাট ও দাপটের কথা শুনে হযরত ওমর রা. শুধু বললেন, সে মাহরূম রইল। সে তো আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া খরিদ করেছে। তার এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি। –ফুতূহুল বুলদান, বালাযুরী, পৃ. ১৪২; তারিখে ইবনে খালদুন ১২/২৮১

আমাদের এ আলোচনার অর্থ এই নয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে 'হিকমাহ' অবলম্বন করতেন না বা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির দৌড় বিবেচনায় রাখতেন না। না, আমাদের কথার অর্থ তা নয়। এ তো কুরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বহু ঘটনার পরিপন্থী চিন্তা।

কুরআনে পাকের ইরশাদ–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.

আর আমি সকল নবীকে স্ব স্ব কওমের ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি। যেন তারা লোকদের (আল্লাহর হুকুম-আহকাম) সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারেন। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪

এখানে ভাষা শুধু কিছু শব্দ-বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভাষার বাকরীতি, বোঝাবার কৌশল ও পদ্ধতি সবই শামিল। এর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হযরত ইউসুফ আ. তাঁর দুই কারা-সঙ্গীকে দাওয়াত দেয়ার ঘটনায়; এবং হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত মূসা আ. স্ব স্ব জাতি ও সমকালীন দুই দাম্ভিক সম্রাটের সাথে কথোপকথনে।

আল্লাহ তাআলা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে তাঁকে এবং তাঁর মাধ্যমে কুরআনের প্রত্যেক পাঠক ও ইসলামের প্রত্যেক দাঈ ও মুবাল্লিগকে এই নির্দেশনা দান করেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

(হে নবী!) আপনার রবের পথে ডাকুন হিকমত ও সুন্দর উপদেশের দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়। –সূরা নাহল (১৬) : ১২৫

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে কোমলতা ও সহৃদয়তা এবং আসানী ও সহজতা অবলম্বনের সাথে সাথে সুসংবাদদানেরও বিশেষ তাকীদ করতেন।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. ও হযরত আবু মূসা আশআরী রা.-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়েছেন–

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

সহজ করো, কঠোরতা আরোপ করো না; সুসংবাদ দিও, বিমুখ করো না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০৩৮)

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

(হে মুহাম্মাদ!) আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের জন্য কোমল হয়েছেন; আপনি যদি রুক্ষস্বভাব ও কঠোরহৃদয় হতেন তাহলে ওরা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৯

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে বলেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

সহজতা সৃষ্টিকারীরূপে তোমাদের আবির্ভাব, কাঠিন্য সৃষ্টিকারীরূপে নয়। –সহীহ বুখারী ১/৩৫ হাদীস ২২০

এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহয় অনেক দলীল রয়েছে, যা গণনা করা কঠিন। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার 'তাইসীর' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ববর্তী নবীগণেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটিই ছিল। কুরআন মাজীদে কয়েকজন নবী ও রাসূলের উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ.

ওরা ছিলেন এমন মানুষ, যাদের আমি দান করেছিলাম কিতাব, সিদ্ধান্ত-গ্রহণের শক্তি ও নবুওত। –সূরা আনআম (৬) : ৮৯

তবে এই সহজতা ও পর্যায়ক্রম অনুসরণের ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষার পন্থা ও উপায় এবং দ্বীনের শাখাগত বিধিবিধান। দ্বীনের আকাইদ, বুনিয়াদী নীতি ও বিধান এর ক্ষেত্র নয়। আকাইদ ও হুদূদ শ্রেণির বিষয়গুলোতে প্রতি যুগের নবীগণ ছিলেন লোহার চেয়েও কঠিন এবং পাহাড়ের চেয়েও অটল।

* * *

চতুর্থ বিষয় হল, নবুওতের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের এক বিশিষ্ট দিক হচ্ছে, তাঁদের আসল জোর হয়ে থাকে আখেরাতের জীবন ও তার সাফল্যের উপর। তাঁরা এর আলোচনা এত বেশি করেন এবং এ বিষয়ে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যে, এটিই হয়ে ওঠে তাঁদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের বাণী ও জীবনকাহিনীর এক নির্মোহ পাঠকের কাছে পরিষ্কার উপলব্ধি হবে যে, আখিরাতই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য এবং তাঁদের সামনে তা যেন ছিল এক প্রত্যক্ষ সত্য। এই চেতনা ও বিশ্বাস পরিণত হয়েছিল তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতির অংশে এবং তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতিকে। মুমিন ও ফরমাবরদার বান্দাদের জন্য আখিরাতে আল্লাহ তাআলা যে নায-নিয়ামত রেখেছেন আর কাফির ও নাফরমানদের জন্য যে আযাব প্রস্তুত রেখেছেন তা অনুক্ষণ চেতনা ও স্মরণে জাগরূক থাকার কারণেই তাঁরা মানুষকে বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর সাথে আবদিয়াত ও দাসত্বের সম্পর্ক রক্ষার দাওয়াতে প্রণোদিত হয়ে উঠতেন, এই চেতনাই তাঁদের অস্থির ও বেচাইন করে তুলত এবং তাঁদের রাতের নিদ্রা ও দিনের শান্তি এমনভাবে হরণ করত যে, কোনো অবস্থাতেই তাঁরা আর স্বস্তি পেতেন না।

সীরাতের প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠক এ বিষয়টিও স্পষ্ট উপলব্ধি করবেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম শুধু চরিত্রের শুদ্ধি ও নৈতিকতা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ঈমান বিল আখিরাহ বা আখিরাতে ঈমান আনার দাওয়াত দেননি। যদিও এটা ঠিক যে, চারিত্রিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি ছাড়া ইসলামী সমাজ কেন, ন্যূনতম পর্যায়ের কোনো সুস্থ সমাজও গড়ে উঠতে পারে না। এ এক ঐতিহাসিক সত্য, মানবজাতির গোটা ইতিহাস এর সাক্ষী। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের কর্মপন্থা ও জীবনাদর্শ এবং তাঁদের নায়েবগণের কর্মপন্থাও এক্ষেত্রে ভিন্নতর, ভিন্নমাত্রার। এখানে পার্থক্যটি হচ্ছে, আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতে এটি ঈমানের অংশ এবং গভীর আবেগ ও বিশ্বাসে আপ্লুত। পক্ষান্তরে অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকের কাছে তা নিছক সামাজিক প্রয়োজন ও বিধিবদ্ধতা। ফলে নৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখেই এর নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়া হয় এবং এর গুরুত্বের উপলব্ধিও সীমাবদ্ধ থাকে প্রয়োজনীয়তার স্বরূপ ও মাত্রা উপলব্ধির মধ্যে। এ দুই পন্থার পার্থক্য ও ফলাফল এত স্পষ্ট যে, তা বোঝানোর জন্য যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

* * *

পঞ্চম বিষয় এই যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন প্রকৃত প্রভু ও একচ্ছত্র বিধানদাতা। বিধান দানের অধিকার একমাত্র তাঁর। ইরশাদ হয়েছে–

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

হুকুম শুধু আল্লাহর। --সূরা ইউসুফ (১২) : ৪০

আরো ইরশাদ–

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

এদের কি এমন কিছু শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন সব বিধান দিয়েছে, যার হুকুম আল্লাহ দেননি? ! –সূরা শুরা (৪২) : ২১

কিন্তু একইসাথে এ-ও সত্য যে, নিছক শাসক-শাসিত ও রাজা-প্রজার সম্পর্কের চেয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি, উপাস্য ও উপাসকের সম্পর্ক অনেক গভীর ও বিস্তৃত, অনেক সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল।

কুরআন মাজীদে যে বিস্তারিত ও হৃদয়গ্রাহী উপায়ে আল্লাহ তাআলার আসমা ওয়া সিফাতের বর্ণনা এসেছে তার উদ্দেশ্য কিছুতেই এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছে শুধু এইটুকু চান যে, বান্দা তাঁকে শুধু এক নিরঙ্কুশ বিধানদাতা মনে করুক এবং তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতায় কাউকে শরীক না করুক। বরং এই পবিত্র আসমা ওয়া সিফাতের বয়ান, কুরআনের পাতায় পাতায় তাঁর কর্ম ও নিআমতের বর্ণনা, আয়াতে আয়াতে তাঁর প্রতি মুহাব্বত-ভালবাসা ও সদাসর্বদা তাঁর যিকর ও স্মরণের যে আদেশ ও উৎসাহ–এর পরিষ্কার দাবি, আল্লাহ তাআলাকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে মন-প্রাণ ঢেলে দিতে হবে। তাঁর প্রশংসার গীত গাইতে হবে, উঠতে-বসতে তাঁরই পবিত্র নাম স্মরণ করতে হবে এবং অনুক্ষণ তাঁরই চিন্তা মন-মস্তিষ্কে জাগরূক থাকতে হবে। তাঁরই ভয়ে ভীত থাকতে হবে, তাঁরই সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করতে হবে, তাঁরই পথে সব কিছু উজাড় করে দেওয়ার, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করার উন্মাতাল প্রেরণা জাগরূক থাকতে হবে। ●

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

[*অনুবাদে :* মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ]

সম্পাদকীয়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হওয়া কাম্য। আর মুমিনের তো শুধু চৌকস হওয়া নয়, তাকে হতে হবে আপন ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ।

এক প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বলেছেন, 'লোকসমাজে তোমাদের হতে হবে তিলক-সদৃশ।' শ্রী, সৌন্দর্যে ও পারিপাট্যে তিলক-সদৃশ। এই নবী-নির্দেশনার অনুসরণে মুমিনকে হতে হবে অন্তরে-বাহিরে সুরভিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত। বেশ-ভূষায়, আচরণে-উচ্চারণে সব কিছুতেই থাকতে হবে তার উজ্জ্বল আদর্শের প্রতিফলন। তার চেতনার আলো, বিশ্বাসের সুরভি, ভাষার সৌকর্য যেন চারপাশকে করে তোলে মুগ্ধ ও মোহিত, আলোকিত ও আলোড়িত।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভাষার যত্ন ও পরিচর্যার এর চেয়ে গভীর ও যথার্থ শিক্ষা আর কিছু হতে পারে কি।

বস্তুত ঈমানের আলো-ই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে আমাদের ভাব প্রকাশের যোগ্যতাটিরও সূত্র ও স্বরূপ, এর প্রয়োগ ও ব্যবহারের মৌলিক সীমারেখা। তেমনি ঈমানই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয় ভাষা-কেন্দ্রিক সকল অন্যায়-অনাচার এবং জাহেলী চিন্তা ও কর্মের স্বরূপও।

কে না বুঝবে, ভাষাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবকরূপে। অথচ জ্ঞানহীন ও জাহেলিয়াতগ্রস্ত অনেক মানুষের কাছে স্ব স্ব অঞ্চলের ভাষা তার এই স্বাভাবিক অবস্থান অতিক্রম করে উন্নীত হয়ে যায় ভক্তি ও প্রণামের স্থানে। এর উপর আরোপিত হয় দেবত্বের ছাপ। ফলে মানুষের সেবকের স্থলে সে দখল করে বসে সেবিতের, এমনকি উপাস্যের স্থান। ভাষা তখন আর রহমত থাকে না, আযাবে পরিণত হয়; নির্মাণের উপায় থাকে না, ধ্বংসের যূপকাষ্ঠে পরিণত হয়। একে কেন্দ্র করে তৈরি হয় দলাদলি-সম্প্রদায়িকতা। জ্বলে ওঠে হিংসা, হানাহানির আগুন। তখন এই ভাষা-দেবীর বেদীমূলেই বলী হয়ে যায় মানুষ ও তার সম্পদ-সম্ভ্রম, যার জন্যে এই ভাষার সৃষ্টি!

কে না বুঝবে যে, ভাষা মানুষের জন্য, মানুষ ভাষার জন্য নয়। একজন মানুষের মন-প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের মূল্য ভাষা ও সাহিত্যের সুবিপুল সম্ভারের চেয়েও অনেক বেশি।

ভাষা এসেছে সত্য-ন্যায়ের গোলাব ফোটাবার জন্য, প্রীতি-ভালবাসার পুষ্প বর্ষণের জন্য। ভাষা তো নয় অবিশ্বাস-অশ্লীলতা বিস্তারের জন্য কিংবা ঘৃণা-শত্রুতার বিষ ছড়াবার জন্য।

আল্লাহ-প্রদত্ত ভাষাকে যদি অবিশ্বাস-অশ্লীলতার বিস্তারেই ব্যবহার করা হয় তাহলে এর চেয়ে কি ভালো নয় মূক ও বধির হওয়া?

সত্য বটে, একমাত্র ঈমানই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে। মানবের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সঠিক বিকাশ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে। আর তাই ঈমান ও আমলে ছালেহ থেকে বঞ্চিত মানুষ নেমে যায় অবলা পশুর স্তরে; বরং তারও নীচে। তার যোগ্যতাগুলোই তখন তার অবক্ষয়-অধঃপতন ত্বরান্বিত করে। কত সত্য মহান স্রষ্টার বাণী–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। অতপর আমি তাকে পরিণত করি হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য তো রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। –সূরা ত্বীন (৯৫) : ৪-৬

তাই আসুন, ঈমানের দীপ জ্বালি, ঈমানের পথে চলি। ঈমানই পথ, ঈমানই পাথেয়। ঈমানই আমাদের কর্ম ও রচনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ●

দৃষ্টি আকর্ষণ

আলকাউসার রবিউল আউয়াল ১৪৩৯/ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় (পৃ. ৩-৪) 'হযরাতুল উস্তায মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' লেখাটিতে কিছু অসংগতি রয়ে গেছে, যা এখানে ঠিক করে দেওয়া হল :

১. 'খেড়িহর' নামটি সব জায়গায় লেখা হয়েছে– 'খেড়িহড়'। শুদ্ধ বানান হল, 'খেড়িহর'।

২. পৃ. ৩, কলাম ২, প্যারা ১-এ আছে 'পান্দেনামা খাকী'। এখানে হবে 'পান্দেনামা আত্তার'। পান্দেনামা খাকী ব্যক্তিগতভাবে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে; কিন্তু এটি নেসাবে ছিল না এবং হযরাতুল উস্তাযের কাছেও তা পড়া হয়নি।

৩. পৃ. ৪, কলাম ২, প্যারা ৪-এ রয়েছে– '১৪১৯ হিজরীর মুহাররম বা সফর থেকে ১৪২০ হিজরী পর্যন্ত...'। কথাটি এমন হবে– '১৪১৯ হিজরীর শাবান বা রমযান থেকে ১৪২০ হিজরীর মুহাররম বা সফর পর্যন্ত...'।

৪. পৃ. ৪, কলাম ৩-এ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুল মান্নান, উস্তায, খেড়িহর মাদরাসা-এর নাম যুক্ত হবে। جزاه الله خيرا وجزاهم الله خيرا।

–বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
৯/৪/১৪৩৯ হি.

কম্পাস দ্বারা কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

নামাযে কেবলামুখী হওয়া (তথা বাইতুল্লাহ-মুখী বা কাবামুখী হওয়া) নামাযের অন্যতম প্রধান ফরয। যারা বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় এমন স্থানে নামায পড়েন তাদেরকে হুবহু বাইতুল্লাহ বা হুবহু কাবা শরীফ বরাবর মুখ করে নামায আদায় করতে হয়। এটাকে বলা যায় 'আইনে কেবলা' (একেবারে সোজা কেবলা)। তাদের জন্য সোজা কেবলামুখী–কাবামুখী হওয়া জরুরি। আর যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় না এমন কোনো স্থানে কেউ নামায পড়লে (চাই বিশ্বের যেখানেই হোক না কেন) তার মুখ হুবহু বাইতুল্লাহ বরাবর না হলেও চলে, তবে বাইতুল্লাহর বা কেবলার দিকের মধ্যে থাকতে হবে। একে বলা হয় 'জেহাতে কেবলা'। জেহাতে কেবলা অর্থ কেবলার দিক বা বাইতুল্লাহর দিক। এই 'কেবলার দিক' বা 'বাইতুল্লাহর দিক' বলতে বোঝায় বাইতুল্লাহ যে বরাবর অবস্থিত তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। নামাযীকে অবশ্যই এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে অভিমুখী থাকতে হবে। এর বাইরে অভিমুখী হয়ে গেলে নামায হবে না। কেননা পৃথিবীর বৃত্ত হচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রী, আর মৌলিক দিক হচ্ছে ৪টি। অতএব একটা দিক বলতে বোঝায় (৩৬০÷৪=) ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। সুতরাং কেবলার দিক বলতেও ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকেই বোঝাবে। তাই কাবা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফ যে বরাবর অবস্থিত (৩৯° ৩৯' পূর্ব দ্রাঘিমা ও ২১°২৫' উত্তর অক্ষাংশ) তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রুখ (অভিমুখিতা) থাকলেও নামায হয়ে যাবে। আমাদের দেশে যেসব মসজিদ রয়েছে তা নির্মাণের সময় অনেকেই কম্পাস ধরে হুবহু বরাবর কেবলা ঠিক রেখে মেহরাব তৈরি করেননি। বরং আশপাশের মসজিদ দেখেই কেবলা নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এতে করে সেগুলোর অনেকটাতে হয়তো সোজা কেবলা রক্ষা হয়নি। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রায়শই দেখা যায় সেগুলোর কেবলা পূর্বোল্লিখিত ৯০ ডিগ্রীর মধ্যেই রয়েছে। অতএব এসব মসজিদে নামাযে কোনোই সমস্যা নেই। তবে কোনো মসজিদের কেবলা প্রকৃতই ৯০ ডিগ্রীর বাইরে থাকলে তা অবশ্যই সংশোধন করে নেয়া চাই। কিন্তু ইদানিং মানুষের হাতে হাতে মোবাইল থাকে। আর অনেক মোবাইলে থাকে ডিজিটাল সাধারণ কম্পাস বা কেবলা কম্পাস। এ সুবাদে অনেকেই মোবাইলে সাধারণ কম্পাস বা কেবলা কম্পাস দেখে মসজিদের কেবলা সোজা বরাবর না পেলেই এবং একটু ডানে-বামে বাঁকানো থাকলেই হৈ চৈ শুরু করেন যে, এই মসজিদের কেবলা ঠিক নেই, এতে নামায হবে না। এরূপ লোকদের অনেকেই সোজা কেবলার ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী –সর্বমোট এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে মুখ থাকলেও নামায হয়ে যায়– এ মাসআলাটি জানেন না। তদুপরি শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল শিপে ব্যবহৃত জাইরো কম্পাস (Gyro compass) নন ম্যাগনেটিক হওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ চুম্বকের কারণে সে কম্পাস প্রভাবিত হয় না। ফলে তা উত্তরসহ অন্য সব দিক সঠিক প্রদর্শন করে। কিন্তু অন্য যেকোনো ধরনের কম্পাস (এনালগ হোক বা ডিজিটাল) ম্যাগনেটিক কম্পাস হওয়ার কারণে হুবহু দিক দেখায় না– এ বিষয়টাও জানা থাকা দরকার। তাহলেই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে যে, সোজা কেবলা কোন্ দিকে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের অভিমুখিতা ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রয়েছে কি না।

এনালগ বা ডিজিটাল যে কম্পাসই হোক না কেন তা যে হুবহু দিক দেখায় না– এ বিষয়টা বোঝার জন্য জানতে হবে কম্পাসের মাধ্যমে প্রথমে উত্তর দিক নির্ণিত হয় এবং তা থেকে অবশিষ্ট দিকগুলো নির্ণিত হয়। আরও জানতে হবে উত্তর রয়েছে দুই ধরনের। একটি হল ভৌগোলিক উত্তর (Geographical North) তথা প্রকৃত উত্তর (যেদিকে উত্তর আকাশের ধ্রুব তারা অবস্থিত)। আর অপরটি হল চৌম্বক উত্তর (Magnetic North)। আর কম্পাস যে উত্তর প্রদর্শন করে তা হচ্ছে চৌম্বক উত্তর। চৌম্বক উত্তর ও ভৌগোলিক উত্তর এক নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ও ভৌগোলিক উত্তর মেরুর অবস্থান এক জায়গাতে নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে ডানে/বাঁয়ে অবস্থান করে। চৌম্বক উত্তর স্থির থাকে না বরং কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে সরে থাকে। যেমন : নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন সময়ে চৌম্বক উত্তরের অবস্থানে পার্থক্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

বিভিন্ন সনে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান

সন	উত্তর অক্ষাংশের যেখানে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান	যে দ্রাঘিমায় চৌম্বক উত্তরের অবস্থান
১৯০০	৭০.৫° উত্তর অক্ষাংশ	৯৬.২° পশ্চিম দ্রাঘিমা
১৯৫০	৭৪.৬° উত্তর অক্ষাংশ	১০০.৯° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০০০	৮১.০° উত্তর অক্ষাংশ	১০৯.৬° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০০৫	৮৩.২° উত্তর অক্ষাংশ	১১৮.২° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১০	৮৫.০° উত্তর অক্ষাংশ	১৩২.৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৫	৮৬.৩° উত্তর অক্ষাংশ	১৬০.০° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৬	৮৬.৪° উত্তর অক্ষাংশ	১৬৬.৩° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৭	৮৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ	১৭২.৬ (বর্ণনা ভিন্নে ১৭২.৫) পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৮	৮৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ	১৭৮.৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা

২০১৮-এর পর থেকে আবার উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে।

২০১৯	৮৬.৪° উত্তর অক্ষাংশ	১৭৫.৩° পূর্ব দ্রাঘিমা
২০২০	৮৬.৪° উত্তর অক্ষাংশ	১৬৯.৮° পূর্ব দ্রাঘিমা

(নেটে Magnetic North, geomagnetic and magnetic poles অথবা Where is the magnetic north pole right now? শিরোনামে চৌম্বক উত্তরের এই স্থান পরিবর্তনের ডাটা দেখে নেয়া যেতে পারে।)

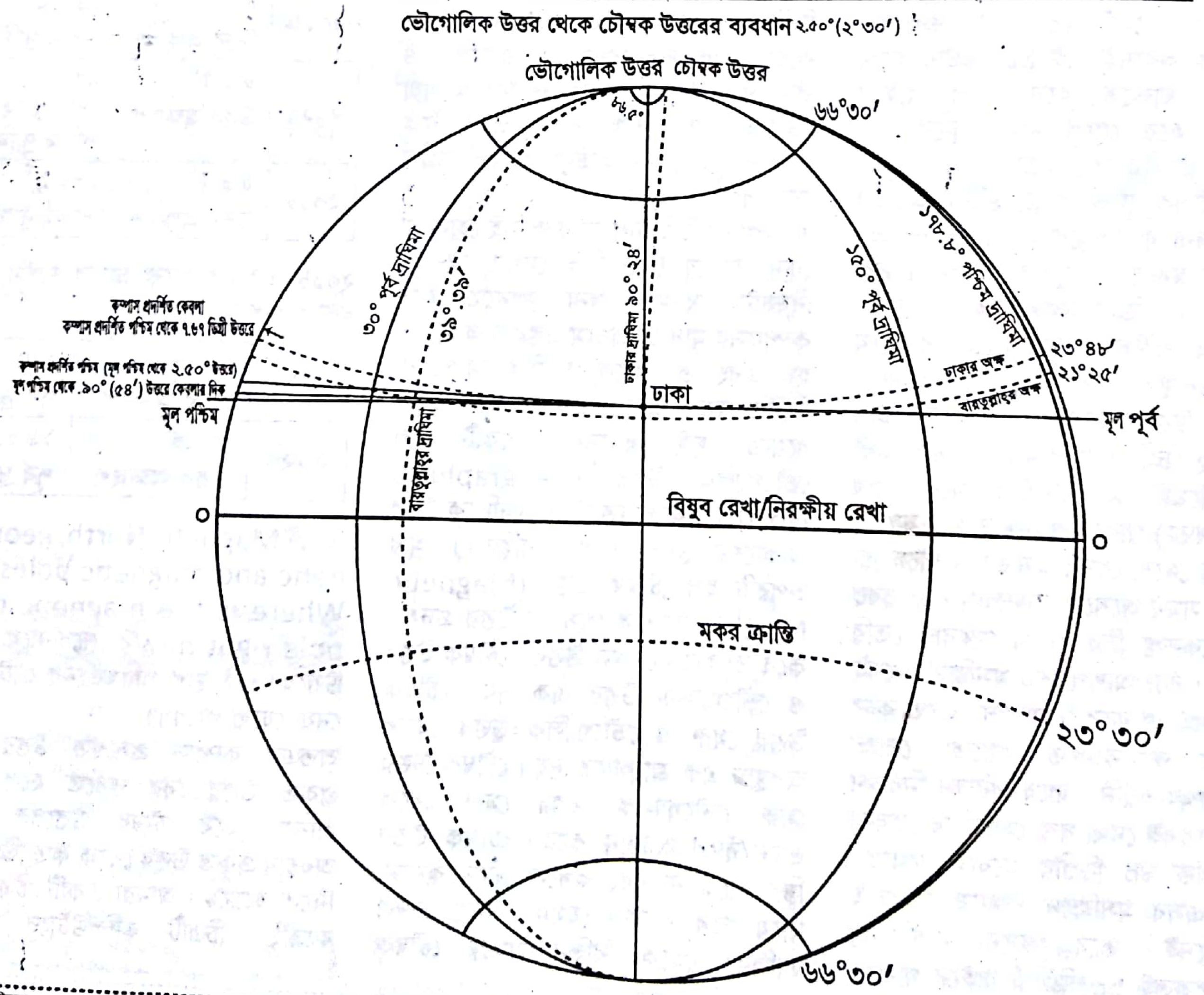
অতএব কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে প্রকৃত উত্তর বের করতে হলে প্রথমে জানতে হবে চৌম্বক উত্তরের বর্তমান অবস্থান প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে রয়েছে। আমরা একটি চিত্র প্রদর্শন করেছি। চিত্রটি কম্পিউটারে যথাসাধ্য

সুক্ষভাবেই আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তর ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০' (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) পূর্বে অবস্থিত। অতএব কম্পাস যে উত্তর দেখাবে তা থেকে এই পরিমাণ পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এই প্রকৃত উত্তরের ভিত্তিতে অন্যান্য দিক নির্ণিত হবে। তারপর যেখান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে জায়গার দ্রাঘিমা অক্ষ ও বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা অক্ষ নির্ণয় করে বায়তুল্লাহ কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করতে হবে।

আমাদের প্রদত্ত চিত্রের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করা সহজ। চিত্রটি ঢাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ চিত্রের আলোকে অন্য যে কেউ তার স্থানের জন্য চিত্র অংকন করে নিতে পারবেন। (তবে অবশ্যই চিত্র তৈরির কাজটি দক্ষ হাতে সম্পন্ন হতে হবে। বর্তমানে কম্পিউটারে মোটামুটি এরূপ নিখুঁত চিত্র তৈরি করা যায়।) প্রথমে একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝে একটি দ্রাঘিমা রেখা টানুন। এটা হবে যে স্থান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে স্থানের দ্রাঘিমা। তারপর বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা রেখা (৩৯°৩৯' পূর্ব দ্রাঘিমা) টানুন। বায়তুল্লাহর অক্ষরেখা (২১°২৫' উত্তর অক্ষাংশ) টানুন। তারপর যে স্থান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা টানুন। পূর্বে বলা হয়েছে বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝে উত্তর দক্ষিণে যে রেখা হবে সেটা হবে সেই স্থানের দ্রাঘিমা রেখা। যেমন ঢাকা থেকে কেবলা বের করতে চাওয়া হলে ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০°২৪' এবং অক্ষ ২৩°৪৮'। এভাবে ঢাকার দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা টানুন। এবার বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানের রেখা তথা ঢাকার দ্রাঘিমা রেখা ঢাকার অক্ষরেখাকে যে স্থানে ক্রস করবে সেই ক্রসিং পয়েন্ট হল ঢাকার অবস্থান। এবার ঢাকার অক্ষরেখা বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে একটি সোজা রেখা টানুন। এটা হবে ঢাকা থেকে সোজা পূর্ব পশ্চিমের দিক বরাবর রেখা। সবশেষে ঢাকার অবস্থান থেকে একটি রেখা বায়তুল্লাহর অবস্থানকে (বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার ক্রসিং পয়েন্টকে) ক্রস করে বৃত্তের দিকে নিয়ে যান। এই রেখা বৃত্তের যেখানে গিয়ে মিলিত হবে সেটা সোজা পশ্চিমের রেখা, যেখানে বৃত্তে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে যতটুকু যেদিকে সরে থাকবে সেই পরিমাণই হবে ঢাকা থেকে বায়তুল্লাহর অবস্থান- কোন্ দিকে কত ডিগ্রী সরে অবস্থিত তার নির্ণয়। নিম্নে এমন আমাদের প্রদত্ত চিত্রটি দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে বায়তুল্লাহ ঢাকা থেকে .৬০° (দশমিক ৬০ ডিগ্রী) বা ৩৬' (৩৬ মিনিট) উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ মনে করতে পারেন বায়তুল্লাহর অবস্থান যখন ২১°২৫' উত্তর অক্ষাংশে আর ঢাকার অবস্থান ২৩°৪৮' অক্ষাংশে, তাহলে ঢাকা থেকে বায়তুল্লাহ (২৩°৪৮' - ২১°২৫'=) ২°২৩' (২ ডিগ্রী ২৩ মিনিট) দক্ষিণ দিকে হওয়ার কথা। এরূপ মনে করা ভুল। কারণ অক্ষরেখা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে বেঁকে গিয়ে থাকে। সব অক্ষরেখাই যেকোনো স্থান থেকে আগে পিছের দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে বেঁকে যায়। আমাদের প্রদত্ত চিত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যাবে।

পূর্বোক্ত বিষয়টা সামনে রেখে আমরা উদাহরণস্বরূপ ঢাকা থেকে সোজা কেবলার

২০১৮ সালের জন্য প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান ও কেবলার দিক নির্ণয়ের সহযোগী একটি চিত্র



দিক নির্ণয় করার ৪টা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। (ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানের বিষয়টাও এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া যাবে।)

১. ধ্রুবতারার সাহায্যে কেবলা নির্ণয়

উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা চিহ্নিত করুন। (সপ্তর্ষীমণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারা চিহ্নিত করা যায়।) ধ্রুবতারা প্রকৃত উত্তর দিকে অবস্থিত। এটা স্থির তারা, কখনও তার স্থান পরিবর্তন হয় না। অতএব ধ্রুবতারার দিক হচ্ছে প্রকৃত উত্তর দিক। এর ভিত্তিতে প্রকৃত পশ্চিম দিক নির্ণয় করুন। সেই পশ্চিম দিক থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪' (৫৪ মিনিট) উত্তরে সোজা কেবলার দিক।

২. এনালগ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়

এনালগ কম্পাস দিয়ে প্রকৃত উত্তর বের করুন। উল্লেখ্য, সব কম্পাসই চৌম্বক উত্তর নির্ণয় করে থাকে প্রকৃত উত্তর নয় –যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি–। তাই কম্পাস প্রদর্শিত চৌম্বক উত্তর প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করুন। এটা বের করার পদ্ধতি হল চৌম্বক উত্তর কত দ্রাঘিমা ও অক্ষে অবস্থিত তা বের করুন। তারপর ঢাকার (অর্থাৎ যেখান থেকে দিক নির্ণয় করতে চান এবং যে স্থানটিকে চিত্রে বৃত্তের দ্রাঘিমা [মধ্যরেখা] ও অক্ষের ক্রসিং পয়েন্টে চিহ্নিত করেছেন।) অবস্থান থেকে একটি রেখা উক্ত চৌম্বক উত্তরের দ্রাঘিমা ও অক্ষের ক্রসিং পয়েন্ট ভেদ করে বৃত্তে নিয়ে সংযুক্ত করুন। তারপর প্রকৃত উত্তর থেকে এই সংযুক্তির পয়েন্টের দূরত্ব মাপুন। সেটাই হবে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের দূরত্ব। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী ২০১৮ সালে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান হচ্ছে ৮৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৭৮.৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা। এবার উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আঁকা আমাদের প্রদত্ত চিত্রে দেখুন ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান হয় ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০' (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট)। অতএব কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে ২.৫০° পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এর ভিত্তিতে প্রকৃত পশ্চিম নির্ণয় করুন। সেই পশ্চিম দিক থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪' (৫৪ মিনিট) উত্তরে সোজা কেবলার দিক। (উল্লেখ্য, যেকোনো কম্পাস ব্যবহারের সময় কম্পাসের অবস্থানের আশেপাশে যেন লোহা জাতীয় কোনো কিছু না থাকে। কেননা তাতে কম্পাস প্রভাবিত হবে।) অথবা কম্পাস যে পশ্চিম দেখাবে তা যেহেতু প্রকৃত পশ্চিম থেকে ২.৫০° উত্তরে। তাই কম্পাস প্রদর্শিত পশ্চিম থেকে ১.৬০° (২.৫০° - .৯০° = ১.৬০°) পরিমাণ দক্ষিণে হবে সোজা কেবলা।

৩. ডিজিটাল সাধারণ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়

ডিজিটাল সাধারণ কম্পাস দিয়ে কেবলা বের করতে চাইলে এনালগ কম্পাস দিয়ে কেবলা বের করার যে পদ্ধতি পূর্বে বলা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে।

৪. ডিজিটাল কেবলা কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়

ডিজিটাল কেবলা কম্পাস দিয়ে কেবলা নির্ধারণ করতে হলে জানতে হবে ডিজিটাল কেবলা কম্পাস কেবলা দেখায় ২৭৭.৬৭°। কোনো কোনোটায় দেখায় ২৭৭.৬৮°। কোনো কোনোটায় দেখায় ২৭৮°। এটা বুঝতে হলে আগে কম্পাসের ডিগ্রী বুঝতে হবে। কম্পাসে মোট ৩৬০ ডিগ্রী থাকে। উত্তরদিকে থাকে ০ ডিগ্রী। পূর্বদিকে থাকে ৯০ ডিগ্রী। দক্ষিণে ১৮০ ডিগ্রী। পশ্চিমে ২৭০ ডিগ্রী। অতএব যেকোনো স্থানে কম্পাস ধরলে ২৭০ ডিগ্রী (কম্পাসের) হল সেই স্থানের প্রকৃত পশ্চিম। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকার সোজা কেবলা হচ্ছে প্রকৃত পশ্চিম থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪' (৫৪ মিনিট) উত্তরে। অতএব কেবলা কম্পাস যখন ২৭৭.৬৭ ডিগ্রীকে কেবলা দেখাচ্ছে তার অর্থ হল কম্পাসের পশ্চিম থেকে ৭.৬৭ ডিগ্রী উত্তরে কেবলা দেখাচ্ছে। আর কম্পাসের পশ্চিম যেহেতু প্রকৃত পশ্চিম থেকে ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০' (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) উত্তরে, তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে, কেবলা কম্পাস প্রকৃত পশ্চিম থেকে (৭.৬৭+২.৫০-.৯০=) ৯.২৭ ডিগ্রী উত্তরে কেবলা দেখাচ্ছে। তাই কেবলা কম্পাস যে কেবলা দেখায় তার থেকে ৯.২৭ ডিগ্রী দক্ষিণে হবে প্রকৃত সোজা কেবলা। উল্লেখ্য, এক ধরনের কেবলা ডিরেকশন (Qibla direction) এ্যাপ রয়েছে, তাতে কেবলার দিকে সোজা রেখা টেনে দেখানো হয়। তাতেও ২৭৭.৬৭ ডিগ্রীর দিকে কেবলা দেখানো হয়ে থাকে। আরও উল্লেখ্য, কেবলা নির্ণয়ের উপরোক্ত পদ্ধতি চতুষ্টয়ের মধ্যে ১ম পদ্ধতিই সবচেয়ে উত্তম। তারপর ২য় পদ্ধতি তথা এনালগ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি। ডিজিটাল কম্পাসের সেন্সর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে থাকে বিধায় সামান্য অসমতল অবস্থানে রাখলে বা ধরার মধ্যে সামান্য উনিশ বিশ হলে কিংবা আরও বিবিধ কারণে রেজাল্ট পাল্টে যায়। এনালগ কম্পাসে তেমনটা হয় না।

সবশেষে আর একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে প্রবন্ধটি শেষ করছি। তা হল, কোনো মসজিদের কেবলার রুখ মূল সোজা কেবলা থেকে ৪৫ ডিগ্রী ডানে বা ৪৫ ডিগ্রী বামের মধ্যে থাকলেও নামায হয়ে যায়– কথাটি যেন সর্বদা স্মরণে রাখা হয়। আমাদের এতক্ষণের আলোচনার উদ্দেশ্য হল কোনো মসজিদের কেবলা এর বাইরে থাকলে তারা সংশোধন করে নিবেন, কিংবা নতুনভাবে কোথাও মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলে বা কোনো স্থানের কেবলার দিক সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে চাইলে এই পদ্ধতিগুলোর সহযোগিতা নিতে পারবেন। ●

আমেরিকার সমাজে মুসলমান

মুহাম্মাদ আদম আলী

জীবনের সব প্রথমই মানুষ মনে রাখে। স্বাদ-বিস্বাদ যা-ই হোক। প্রথম বিস্বাদ যত তীব্র হয়, স্বাদ তত মজার হয় না। এজন্য বার বার ফিরে পেতে চায়। পায়ও। সারাজীবনেও আর সেই প্রথমকে ভুলতে পারে না। পঞ্চমবার আমেরিকায় এসে প্রথমবারের কথাই বেশি মনে পড়ছে। সেইবার ডালাসে যে ধর্মীয় পরিবেশ ছিল, এটা এবার তেমন নেই।

ডালাসের রিচারডসনে উঠেছি আমি। অনেক বাঙালী পরিবার বসত গেড়েছে এখানে। অনেকে দেশে সব বিক্রি করে দিয়ে আমেরিকান হয়ে গেছে। কেউ কেউ বাড়ি-গাড়ি করেছে। আবার কারো ভাড়া বাড়িতেই কাটছে জীবন। বাস-ট্রেনে যাতায়াত। বুয়েটের অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছেন। তাদের অবস্থা তুলনামূলক ভালো। চাকরি না থাকলে তাদের অবস্থাও কাহিল হয়ে যায়।

বউ ছাড়া থাকতে পারলেও এদেশে চাকরি ছাড়া থাকা যায় না। আবার চাকরি খুব ভালো হলে বউ হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সম্পদ বেড়ে গেলে ডিভোর্স হয়ে গেলে স্ত্রী অর্ধেক পায়। এই লোভে অনেকে ডিভোর্স নেয়। সেলিব্রেটিদের মধ্যে এটা বেশি হলেও এখন আমজনতাও এর স্বাদ নিতে শুরু করেছে। মুসলমানরাও বাদ পড়ছে না। আমাদের কাছে সবই সমস্যা লাগে। তাদের কাছে সব এক। বেঁচে থাকলেও যা, মরে গেলেও একইরকম। মুসলমানরা কালচারে এক হতে হতে এখন সমবিশ্বাসেও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম জেনারেশন সারেন্ডার না করলেও থার্ড জেনারেশন নাগালে পাওয়া মুশকিল। তবে ব্যতিক্রমও আছে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ আসে আমেরিকায়। মুসলমানরাও আসে। অনেকে পরিবার নিয়ে আসে। অন্যরা যা ইচ্ছা করে। মুসলমানরা তা করতে পারে না। কিন্তু শুরুটা প্রায় সবার একইরকম। প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধাক্কা সামলাতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজনে সব কিছুই জায়েয মনে হয়। এ তালিকা অনেক বড়। তবে মুসলমানদের ভয়ানক কিছু করতে হয়। তাদের দ্বীনদারীতে কম্প্রোমাইজের চাপ বাড়ে। অনেকে দেশে থাকতে হয়ত নামায পড়তেন না। এখানে এসে আরো উদাসীন হন। আর যারা নামায পড়তেন, তাদের অনেকেই ছাড় দেন। এই কদিন পরেই সাচ্চা নামাযী হয়ে যাব! তাদের 'ক'দিন' আর শেষ হয় না। একসময় হয়ত নামায পড়েন, তখন বেলা পড়ে যায়। অবেলার দ্বীনদারিতে পরবর্তী জেনারেশন টেকানো যায় না। সব স্যাটেল হয়ে গেলেও ইসলামের মূল্যবোধ ঠিক থাকে না। মুখ থুবড়ে পড়ে।

। ২ ।

আমেরিকায় অনেকগুলো স্টেট; পঞ্চাশটি। এর মধ্যে নিউইয়র্ক ব্যতিক্রম। মুসলমানদের সংখ্যা, মসজিদ-মাদরাসা বেশি। উলামায়ে কেরামও অনেক। অন্য শহরগুলোতে এরকম নেই।

এদেশ অনেক বড় দেশ। শুধু নিউইয়র্ক শহর দেখলে দেশ বোঝা যায় না। শহর থেকে বের হয়ে কোনো হাইওয়েতে উঠলেই চোখে পড়ে। কত যে প্রান্তর খালি পড়ে আছে, হিসেব নেই। অন্যান্য স্টেটে আরো বেশি। প্রকৃতির বিশালতায় মানুষের মনও বিশাল হওয়ার কথা। মন তো এক অনন্য সৃষ্টি। এটা বিশাল হওয়ার জন্য জায়গা লাগে না। দ্বীনের সঠিক বুঝ লাগে। এখানে কেন যেন সেটা উবে যায়!

মুসলমানরা অনেকেই হালাল-হারাম বেছে চলে। অনেকে পারে না। আমার এলাকার পরিচিত একজন মদ খান না। কিন্তু মদের ভালো ককটেল বানাতে পারেন। তিনি যে হোটেলে কাজ করেন, এজন্য তার অনেক সুনাম। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ছেলেদের এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা পড়ালেখা করে বড় চাকরি করছে। বাবা খুব খুশি। তারপর? হঠাৎ এক ছেলে খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করে ফেলল। আরো দুই ছেলের অবস্থাও বলার মতো না। অনেক মুসলমান ঘরেই এই এক নতুন সমস্যা। ছেলে তো ইসলামেই থাকছে না!

খুব বেশি তাবলীগে সময় দেন যারা, অথবা সন্তানদের মাদরাসায় পড়ান, তারা ছাড়া বাকিদের অবস্থা একইরকম। কী রকম? তারা ছেলেদের একটু কুরআন পড়িয়ে দিতে পারলে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচেন। আর মাঝে মাঝে যদি মসজিদে নিতে পারেন, তাহলে তো ছেলের মুসলমানিত্ব নিশ্চিত। এভাবে হয় না কিছুই। বেশিরভাগই বাবা-মাকে খুশি করার জন্য এসব করে। বয়স আঠারো হয়ে গেলেই ছেলে আসল আমেরিকান হয়ে ওঠে। তখন বাবা-মা'দের আর কিছু করার থাকে না। ছেলের বিয়ের বয়স হয়ে গেলেও জোর করতে পারে না। ছেলের ইচ্ছের কাছে নত হয়ে থাকতে হয়। সমাজ তো এখানে সামাজিক না। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কেউ কিছু মনে করে না।

যারা দ্বীনদারি রক্ষা করে চলার খুব চেষ্টা করেন, তারা নিজেরা নামায-কালাম পড়েন। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কিছু কসরত করেন। কিন্তু তালীম দেন না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আর কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া ইসলামের আর কিছু শেখে না। রাসূলের নাম বলতে পারলেও সাহাবী কী জিনিস– জানে না। ইসলামের নিজস্ব কালচার আছে, এ বোধ উন্মেষের কোনো সুযোগই পায় না। তারা আমেরিকান কালচার নিয়ে পড়ে থাকে। ঘরে-বাইরে। খুব সহজেই দ্বীনদারী বিদায় নেয়। এটা হলো সেকেন্ড জেনারেশন। এরা নিজেরা যা শিখেছে, তা প্রাক্টিস করে না। থার্ড জেনারেশন আসতে আসতে সব ভুলে বসে। একদিন মুসলমান ছিল, এ বোধও আর কাজ করে না। আর খ্রিস্টান বিয়ে করলে তো আমেরিকা জিন্দাবাদ!

। ৩ ।

বাইরে আজ আইস কুল ঠাণ্ডা। হাত-পা জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। তবু মানুষগুলো জমে যায় না। মুখে ঘন হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে দিব্বি বেঁচে থাকে। কাজে যায়। ফিরে আসে। ঘরেই কাটে বেশিরভাগ সময়। ঘরে হট এয়ার সিস্টেম আছে। অনবরত হিটার চলছে। হিটারে শরীর গরম হয়। আত্মার শান্তি মেলে না। শান্তি দেওয়ার মানুষটা নেই। শূন্য ঘর। সেলফোন আর টিভি ছাড়া সঙ্গী কেউ নেই। অনেকের কুকুর থাকে। একটা, দুইটা। বিড়ালও থাকে। সবার থাকে না। বড় নিঃসঙ্গ জীবন। এদেশে এরকম জীবন যে কত, পরিসংখ্যান জানা নেই। মুসলমানও দিন দিন এ সংখ্যা বাড়াচ্ছে।

ফজরের পরে স্টারবাকসের কফি খাচ্ছি। ভোর পাঁচটায় এ দোকানটা খোলে। সূর্য ওঠে আরো পরে– সকাল সোয়া সাতটায়। মানুষ এখানে রোবটের মতো কাজে লেগে যায়। এই একটা জায়গায় কোনো তাড়া দিতে হয় না। ডলার তাকে মেশিন বানিয়ে ফেলে। উপায়ও নেই। কফি খেতে খেতে আমার ভাই গল্প করছেন। এদেশের মানুষের গল্প। কঠিন সব গল্প। শুনলে গা শিউরে ওঠে।

এক ভদ্রলোক দেশ থেকে কেবল বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছেন। নিজে অড জব করে বউকে ডাক্তার বানালেন। পাশ করেই বউ তাকে ফেলে চলে গেল। কোথায় বউয়ের কামাইতে আলীশান জীবন কাটাবে, এখন বউই নাই। অবশ্য বউয়ের কামাইয়ের দিকে এদেশে চেয়ে থাকার সুযোগ নেই। শেয়ারে হয়ত একটু ভালো বাসায় থাকা যেত, এই যা।

এখানে বউ-ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে

মানুষের আশাও কমে যায়। ভালো বাসায় থাকতে পারলেও ভালোবাসা হয় না। মহব্বতকে ওরা বলে ফিলিংস। এই ফিলিংস বুঝতে আমার সময় লেগেছে। Hi Dad! বলা তাদের ফিলিংসের প্রকাশ। তা-ও বছরে একবার!

আরেকদিন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। সঙ্গে আমার ভাই। ভদ্রলোক এসে আমাদের খুব আন্তরিকভাবে এক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলেন। তার স্ত্রী নার্সিং কোর্সে কোয়ালিফাই করেছে। এজন্য গ্রাজুয়েশন পার্টি হবে। সেখানে যেতে বললেন। লোকটার খুশি দেখে আমি অবাক। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী থাকবে তো!

সেকেন্ড জেনারেশনেও বউ থাকছে না। বাবা-মা সত্তর থেকে আশি হাজার ডলার খরচ করে ওয়েডিং পার্টি করছে। এক বছরের মাথায় বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। হু কেয়ারস! দুজনই উচ্চ শিক্ষিত। ভালো চাকুরী করে। সামান্য ইস্যুতেই ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে। তখন এসব ভাঙা মন কী করে? সে বিষয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ভুক্তভোগীরা জানে। অন্যের জানার সুযোগ হয় না।

এদেশে একার কামাইতে সংসার চলে না। স্ত্রীকেও কাজ করতে হয়। সেটা আরেক জীবন। অফিস ডিউটি খুব কম পরিবারই করে। বেশিরভাগ অড জব। তাতে টাইমিং ঠিক থাকে না। একজন যদি বিকেলে ঘরে ঢোকে, আরেকজন রাত বারোটায়। ভালোবাসা তখন টায়ার্ড হয়ে যায়। ডলার গুনেই পার করতে হয় পারিবারিক জীবন।

মরে গেলেও এদেশে শান্তি নেই। কাফন-দাফনে প্রায় দশ হাজার ডলার লাগে। আসল ভালোবাসা তখনো ডলারের চিন্তা থেকে মুক্তি পায় না। আমেরিকার ঘোর কাটলেও ফেরার উপায় নেই।

। ৪ ।

খুব ভালো থাকতে মন চায়। খুব ভালো হতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছেটাই পাল্টে গেছে। মরা গাছে ফুল ফোটে না। এমনিতে ফুল ভালো লাগে। গাছের পরিচর্যা করতে ইচ্ছে করে না। এখানে গাছ কি ছিল নাকি! একদিন হয়ত ছিল। সে গাছ মরে গেছে। এখন ঝরা পাতায় উঠোন ভর্তি। সেখানে ফুলের টবে প্লাস্টিকের ফুল ফোঁটে। শিশিরে সিক্ত হয়। আহ! কী সুন্দর! এ সৌন্দর্যে মুসলমানরা দিশেহারা। একবার দিশা হারালে হুঁশ ফেরানোর কেউ নেই। বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কেউ সহজে প্রবেশ করে না।

বসবাসের জন্য একটা বাড়ি এদেশে খুব জরুরি। আর চলাফেরার জন্য একটা গাড়ি। হোটেল বয় হিসেবে কাজ করলেও এগুলো পেতে অসুবিধা হয় না। বাড়ি-গাড়ি রেডিই আছে। একটু কষ্ট করে কেবল সাহস করতে হয়। মনে সাহস না থাকলেও পরিবেশ সাহসী করে তোলে। গাড়ির দোকানে পয়সা ছাড়া গেলেও একটা কিনে ফেরা যায়। বাড়ির জন্য একটু ঝামেলা সইতে হয়। ইনকামের উপর বাড়ির কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে। সবই মেলে মরগেজের উপর। বিশ্বাসে কমতি নেই এদের। সোস্যাল কার্ড থাকলেই আর কিছু চাইবে না। হাউজ লোন দিয়ে দেবে। মরে গেলেও অনেকের এ লোন শোধ হবে না। অসুবিধা নেই। মরে যান। ব্যাংক তার হিস্যা বুঝে নিবে ঠিকই।

আমেরিকার ইকোনমি সিস্টেম খুব কঠিন। সমাজের কণায় কণায় সুদের চাকা ঘুরছে। দ্বীনদাররা বেঁচে থাকতে চায় না যে এমন না। পারে না। ঘণ্টায় দশ ডলারে কাজ করে সুদের চাকায় তেল না দিয়ে উপায় থাকে না। খুব ভালো বেতনে যারা প্রফেশনাল জব করেন, তারা চাইলে কিছু পারেন। নগদ টাকায় বাড়ি-গাড়ি করেন। এ দলে লাখে এক মিললেও বেশি। শীতের কষ্টে হাত পকেটে পুরে রাখতে হয়। আর সুদের ঘোরে চোখ-কান খোলা রাখা যায় না। জিবটাকে সচল রাখলেই চলে।

বাড়ি-গাড়ি করে অনেকে বিয়ে করে। এদেশে মানুষ অন্যের খবর রাখে না। তবে বিয়ে-শাদীর খবর ঠিকই রাখে। দাওয়াত দিলে ছুটে আসে। নিজেকে চেনানোর এই সুযোগ হাতছাড়া করে না কেউ। বিশাল করে ওয়েডিং পার্টির আয়োজন করে। হাজার হাজার ডলার লোন করে। ক্রেডিট কার্ডে সুদের ধাক্কা লাগে। অন্তরে লাগে না। মেহমানদের হাসি-তামাশায় অন্তর ফুলে ওঠে। আগুনের পর আগুন জ্বলে। আগুন ছাড়ে না কাউকেই। দেখা যায়, লোন শোধ না হতেই বিয়ে ভেঙে যায়। বউ নাই। বিয়ের লোন টানতে হচ্ছে। তারা অবশ্য আবার বিয়ে করে। তবে প্রথমবারের মতো তামাশা আর করতে পারে না।

সুদের আগুন দেখা যায় না। পুড়ে সব ছাড়খাড় করলেও দেখা যায় না। এজন্য শিক্ষাও নেয় না কেউ।

। ৫ ।

সিস্টেম ওয়ার্কস। এটা দেখার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো ভালো জায়গা। আমেরিকাও এর মধ্যে অন্যতম। মানুষ এই একটি কারণে এখান থেকে যেতে চায় না। সুবিধা অসুবিধা বোঝে না। জাগতিক সুবিধা জীবনের জন্য জরুরি। জীবন যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত, তাহলে বেশ মজা হত। এই মজায় যারা মজে যায়, তাদের জন্য নগদ সুবিধাই আসল। মরার পর যে জীবন আছে, সে জীবনের সুবিধা-অসুবিধা তাদের ভাবায় না।

এদেশে লাল বাতি জ্বললে গাড়ি থামে। পুলিশ না থাকলেও থামে। আবার কোথাও বাতি নেই। কেবল লেখা আছে, স্টপ। সেখানেও গাড়ি থামে। আশেপাশে তাকায়। শূন্য প্রান্তর হলেও গাড়ি চালিয়ে দেয় না। হয়ত কোনো মানুষ রাস্তা পার হবে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করে। এমন দৃশ্য অবাক না করে পারে না। বাস-ট্রেনে লাইন ভাংগে না কেউ। ধাক্কা-ধাক্কি নেই। এটুকু শান্তি মানুষ চায়। এ শান্তির এখানে কোনো অভাব নেই। এরকম কিছু আমাদের দেশে ভাবা যায় না। এ মুহূর্তে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। রাস্তায় চলার এই এক সুবিধা জীবনের দর্শনকেই পাল্টে দেয়। সে আর দেশে ফিরে যেতে চায় না।

সরকারী কোনো সুবিধা নিতে এদেশে কোনো ঘুষ দিতে হয় না। সিস্টেম ওয়ার্কস। লাইন লম্বা হলেও ভাগেরটা ঠিকই মেলে। ব্যাংক? গাড়ি থেকেও নামতে হয় না। সীটে বসেই সেরে নেয়া যায় টাকা জমা ও তোলার কাজ।

এখানকার দোকানপাট আরেক জগৎ। জিনিস কিনে বাড়ি গেলেন। দ্রব্যটা পছন্দ হচ্ছে না। ফিরিয়ে দিন। চাইলে টাকাও ফেরত পাবেন। আপনাকে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। এমন দেশ কে ছাড়তে চাইবে? মুসলমানদের অনেক আখলাক তারা নিয়েছে। আমল করছে। ফল পাচ্ছে। আমরা তাদের বাহবা দেই। মনে করতে শুরু করি– তাদের কাছ থেকেই মানবিকতা শিখতে হবে। সবচেয়ে বড় অমানবিকতা– স্রষ্টাকে না মানা। আবার এটা যারা মানে, তারা এদেশে থেকে মুত্তাকী হতে পারতেন। সেখানেও সিস্টেম কাজ করে। তাকে আমেরিকান বানায়, মুত্তাকী হতে দেয় না।

। ৬ ।

ঘরের মানুষ ঘরে থাকতে চায় না। সবাই বাইরে বেরোতে চায়। বাইরের জগৎ দেখতে চায়। দু পা ফেলে গাছের পাতায় শিশির দেখার আশা লুকাতে পারে না। শীতের সকালে দেখে। গ্রীষ্মেও। বেলায়-অবেলায় সবসময় কি পাতায় শিশির থাকে? মানতে চায় না। ওখানে এখন শিশির নেই। যেয়ো না। ঠেকানো যায় না। সে নিজে পরখ করতে চায়। না থাকলেও সে যাবেই। আকাশে মেঘ গর্জন করছে। গর্জন কানে লাগে না। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে বাড়ি ফেরে। ফিরতেই হয়। না ফেরার দেশে পাড়ি দেওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে যাওয়া-আসার মধ্যেই সে থাকে। নারী-পুরুষ সবাই। ছেলে-মেয়েরাও। আঠারোর পরে আর কাউকেই এখন ঘরে রাখা যায় না। সবাই সব অধিকার ভোগ

করে মজা নিতে চায়। সরকারও সেগুলো দিয়েছে। আইন করে নিশ্চিত করেছে। 'আখেরাতের কথা মনে থাকে না!

আমেরিকায় এসে প্রায় সব পুরুষই নারীবাদী হয়ে ওঠে। নারীদের অধিকার দিতে উঠেপড়ে লাগে। আর তাদের প্রথম অধিকার হল কামাই করার সুযোগ দেওয়া। মাইগ্রেন্ট করা মুসলমানদের অনেক পরিবারে শিক্ষিত নারী থাকে। আবার অনেকের এদেশে এসে আর পড়ালেখা করার সুযোগ থাকে না। বয়স হয়ে গেছে। অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। কিন্তু চাকরি করানোর সুযোগ তারা খুব কমই মিস করে। ব্যস, তারপর তাদের আর নারীবাদী তত্ত্ব নিয়ে সংশয় থাকে না।

নারীবাদী কথাটা নারীদের আবিষ্কার নয়। পুরুষদের। চার্লস ফোরিয়ার (Charles Fourier) এই শব্দটির জনক। ফ্রান্সে ১৮৩৭ সাল থেকে শুরু হয়ে এখন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়েছে। নারীরা যদি ঘরেই থাকে, তাহলে তাদের ভোগ করার সুযোগ মিলবে না। সুতরাং একটা ধুয়া তুলে তাদের রাস্তায় বের করতে হবে; অফিস-আদালতে-হাতের নাগালে। সম অধিকারের কথা বলতে হবে। উন্নতির কথা বলতে হবে। আধুনিকতার কথা বলে গণহারে তাদের চাকরি দিতে হবে। হলোও তা-ই। নারীরা বের হল। আগে কোনো ধর্মের নারীরা এত খোলামেলা ছিল না। এখন যখন ধর্ম ফেলে উন্নতির জোয়ার লাগল, তখন আর বাধ মানল না। বের হয়ে একেবারে নিজেদের উজাড় করে দিল। প্রযুক্তি তাদের ভোগ্যপণ্য বানিয়ে ফেলল। যদিও বলা হয়, এটা আধুনিক সংস্কৃতি। মূলত এর মাধ্যমেই তাদের বেহায়াপনার শুরু। এখান থেকেই বাকি অবরুদ্ধ জায়গাগুলোতে পৌঁছে। মুসলমান নারীরাও আর ঘরে থাকতে পারল না।

এদেশে নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে। আমাদের দেশেও করে। এখন গ্লোবাল কালচারে এটা আলোচ্য বিষয় নয়। মূল সমস্যা পর্দার কনসেপ্ট পাল্টে গেছে। জিন্স আর টি শার্টের সংগে মাথায় হিজাব দিলেই পর্দা হয়ে গেল। ধুমধাম পার্টি আর পুরুষদের সংগে অবাধ মেলেমেশায় অসুবিধা দেখে না কেউ। কিছু বললেই তেড়ে আসে। এসব মাসআলা এদেশে বেকার। নাচতে নেমে কেউ ঘোমটা দেয় না। ঘোমটা দেয়ার কথা বলাটাই অন্যায়। নাচ থামাবেন, না ঘোমটা দেওয়ার কথা বলবেন? আসলে ঈমানই...। ঈমানের প্রসঙ্গ তুললেও বিপদ। তারা নামায পড়ে। রোযা রাখে। ইফতার পার্টিও দেয়। এই এক মেলানো-মেশানো কালচার। বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই করতে হয়। আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে। সেটা এতই আস্তে যে, মরে গেলেও আর হয় না। কামিজ ছেড়ে যে নারী জিন্স পরে, তার কাছে ঈমানের সংজ্ঞা ডিফরেন্ট। তাকে ঘরে ফেরানো মুশকিল।

এভাবে ঘরছাড়া নারীরা বাইরের রোদ্দুরে গা পুড়িয়ে ঘরে ফেরে। একদিন বুড়ো হয়। তখন না ভোগ করতে পারে, না ভোগের পাত্র থাকে! ফেলে আসা শৈশব মনে পড়ে। দেশী হুজুরদের কথা মনে উঁকি দেয়। মা-বাবার স্মৃতিও ভেসে ওঠে। কী লাভ হল এতসব করে? গাড়ি-বাড়ি আর বিলাসিতা সব পড়ে থাকে এক কোণে। এখন ফেরার সময়। যিনি এ জীবন দিয়েছিলেন, তার কাছে ফিরে যেতে হবে। একা একা সেসব স্মৃতি মাড়িয়ে যেই একটু ভালো হতে চায়, শরীরের হাড়-গোড় মুচড়ে ওঠে। মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। সুযোগও মেলে না।

। ৭ ।

মানুষ আশা করে। স্বপ্ন দেখে। একটু ভালো থাকতে চায়। কাজ আর আনন্দ নিয়ে থাকতে চায়। নিরিবিলি কাটাতে চায় আলস্যের সময়। ঝামেলায় জড়াতে চায় না। পাশ্চাত্যে এগুলো পেতে স্বপ্ন দেখতে হয় না। এমনিতেই মেলে। কেউ কারো পেছনে লেগে নেই। যে যার কাজ করছে। সামাজিক নিয়ম-কানুন ছকে বাঁধা। সব ঘড়ির কাটায় চলে। মানুষও। ঝামেলা যে হয় না, তা না। চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবি সবই হয়। এর মূলে কাজ করে এদেশের এডুকেশন সিস্টেম। ভারী বোঝা এরা এত হালকা করে বহন করতে জানে, সিস্টেমে না ঢুকলে বোঝা যায় না।

আমাদের দেশে শিশুদের উপর প্রথমে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তারা যখন বড় হয়, তখন সেগুলো মাথা থেকেই ফেলে দেয়। সমাজ অন্ধকারে যেতে থাকে। আলোর মুখ দেখে না। সেক্যুলার হয়েও পাশ্চাত্যের ভালো কিছু নিতে পারে না। কিন্তু খারাপ নিতে ভুল করে না। আমেরিকান এডুকেশন সিস্টেমের মন্দ দিকটা সবাই জানে। ভুক্তভোগী অনেক মুসলমানও সেসব নিয়ে কথা বলতে চান না।

পড়ালেখা করতেই হবে। বড় হতে হলে এর বিকল্প নেই। কত বড় হবে তুমি? এটা কারো জানা থাকে না। টার্গেট থাকে। মজার ব্যাপার হল এদেশে ছেলেরা ফায়ারম্যান হতে চায়, গারবেজম্যান হতে চায়, সুপারম্যানও হতে চায়। চাইতেই পারে। মিডিয়াতে যা দেখে, তা-ই হতে চায়। এডুকেশন সিস্টেম এমন, এলিভেন ক্লাস না পেরুনো পর্যন্ত তার চাওয়া থামে না। তারপর যারা টিকে যায়, তারা সোসাইটিতে আগে বাড়তে পারে। উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে। এ পথ পরিক্রমা খুব সহজ না। মাল্টিকালচারে পড়ালেখা তার মেধা-মননে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। বড় কিছু হতে শেখায়। তবে রিলিজিয়ন পড়ে থাকে।

এদেশে রাস্তা-ঘাট যেমন সুন্দর তেমন স্কুল-কলেজও। খুবই প্রশস্ত জায়গা নিয়ে বানানো। খেলার মাঠ ছাড়া কোনো স্কুল নযরে পড়েনি। শারীরিক ফিটনেস পড়ালেখার অংশ। খেলাচ্ছলেই ছেলে-মেয়েদের পড়ানো হয়। খুবই ইফেক্টিভ। তুলনামূলক পাবলিক স্কুলে পড়া সহজ। খরচ কম। মাইগ্রেট করা অনেক মুসলমান ছেলে-মেয়েদের এখানেই হাতে-খড়ি হয়। তারা যা দেখে, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। কালচার ভেবে লুফে নেয়। তাকেও জাতে ওঠার চেষ্টা করতে হয়। তখন তারা পাত ভুলে যায়। খুব আস্তে আস্তে সে আমেরিকান হয়ে ওঠে। বাবা-মা টের পায় না।

টেন-ক্লাসেই অনেক মেয়ে... হয়ে যায়। বয়ফ্রেন্ড অথবা গার্লফ্রেন্ড বাড়তে থাকে। সমাজে এটা নিয়ে হৈচৈ হয় না। অগোচরে সম্পর্ক গড়ায় অনেক দূর। নারী-পুরুষের অন্যায় সম্পর্কের বিষয়টা তাই পুরোনো আদলেই থাকে। আর রিলিজিয়ন বাসা-বাড়িতে আগে বাড়লেও স্কুল-কলেজে বাড়ে না। পেছনে পড়ে থাকে। আমেরিকান বানাতে চাইলে এটা ধরে রাখতেই হবে। সরকার এই একটা জায়গায় যা খেলার খেলে। মুখে কিছু বলে না। এজন্য বাবা-মা ধার্মিক হোক, তাতে অসুবিধা নেই। সরকার তাদের নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। তাদের সন্তানই টার্গেট। জেনারেশন কিল (Kill) করতে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর নেই।

এদেশে ইসলামী এডুকেশন সিস্টেমও আছে। মসজিদকেন্দ্রিক স্কুল। সব শহরে এখনো গড়ে ওঠেনি। অনেক শহরেই আছে। মুসলমানদের জন্য একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ার সুযোগ করে দিয়েছে এ স্কুলগুলো। উচ্চশিক্ষার দ্বার খোলা রেখেই এর কারিকুলাম বানানো হয়েছে। এর সঙ্গে ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের চর্চা হয়। অনেকে হাফেজও হয়। তবে ধরে রাখাটা সহজ হয় না। ইউনিভার্সিটিতে গেলে তারা তখন মূল ধারায় ফিরে আসে। যাদের ভাগ্য ভালো, তারা নিজেদের বাঁচিয়ে চলে। আর নতুবা গা ভাসিয়ে দিয়ে সত্যিকার আমেরিকান হয়ে ওঠে।

মুসলমান পরিবার কখনো পরবর্তী জেনারেশন হারাতে চায় না। পরিবেশের জন্য ঠিক রাখতেও পারে না। বেঠিক চলতে চলতে আশার আলো দেখে সবাই। একদিন হয়ত জাগরণ হবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। সেদিন কবে আসবে? ●

আত্মমুগ্ধতা : স্বরূপ ও প্রতিকার

শিব্বীর আহমদ

মুগ্ধ হওয়ার মতো কত কিছুই তো আমরা হাতে পাই। অর্থসম্পদ, বংশ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, সন্তানাদি, ইলম-আমল, সৌন্দর্য, সুস্থতা, শারীরিক শক্তি–এমন আরও কত কী! এগুলো আল্লাহ তাআলার নিআমত। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদের এসব নিআমত দান করে থাকেন। এ দুনিয়ার একটি স্বাভাবিকতা হচ্ছে–একজন সবদিক থেকে সুখী হয় না। সব ধরনের নিআমত একা একজন পায় না। কোনো একদিক থেকে অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তি থাকেই। আবার কেউ সব দিক থেকে অসুখীও হয় না। কোটিপতি বাবার ছেলে কোনো কেলেংকারিতে জড়িয়ে খবরের শিরোনাম হয়, তখন এ পৃথিবী তার জন্যে আর সুখের থাকে না। সুখের সব উপকরণ তার কাছে তখন ছাই। আবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত অসহায় বাবা, ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর সাধ্য যার নেই, এমনকি পরিবারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বও যখন ছেলের কাঁধে, সেই ছেলে যখন অতিকষ্টে লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ভালো ফলাফল করে, তখন বাবা যে আনন্দটুকু অনুভব করেন, তা কি লাখ টাকায় কেনা যাবে? আমাদের দেশে প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার পর পত্রিকার পাতায় এমন খবর আমরা নিয়মিতই দেখতে পাই। বলার কথা হল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমরা সকলেই অসংখ্য নিআমত ভোগ করে থাকি। নিআমত পেয়ে কী করতে হবে–সেই নির্দেশনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا.

তুমি বলো, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই তা হয়েছে। তাই তারা যেন এতে আনন্দিত হয়। –সূরা ইউনুস (১০) : ৫৮

এ আনন্দ শোকর আদায়ের আনন্দ। নিআমত পেয়ে নিআমতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আনন্দ। নিআমত পেয়ে বান্দা আনন্দিত হবে–দয়াময় প্রভুর নিকট এ দৃশ্য পছন্দনীয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

সন্দেহ নেই, আল্লাহ তাঁর বান্দার গায়ে তাঁর দেয়া নিআমতের চিহ্ন দেখতে ভালোবাসেন। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮১৯

কিন্তু যে ইসলাম আমাদের পরিমিতিবোধ শেখায়, সবকিছুতে মধ্যপন্থাকেই সেরা পন্থারূপে যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই ইসলামে 'অবাধ' বলে কিছুই নেই। কোনোকিছুই এখানে বাধাহীন নয়, সীমাহীন নয়। নিআমত নিয়ে আনন্দ-প্রকাশ যখন শরীয়তের সীমার ভেতর থাকবে, আনন্দ প্রকাশও তখন নেক আমল হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন বলে গণ্য হবে। কিন্তু সীমা অতিক্রম করলে এ আনন্দ প্রকাশ 'উজ্ব' বা আত্মমুগ্ধতায় পরিণত হয়। এটা এক মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি। এ রোগে আক্রান্ত হলে আনন্দ প্রকাশ আর নেক আমল থাকে না, আনুগত্য বলে বিবেচিত হয় না। আল্লাহ তাআলা এতে অসন্তুষ্ট হন। কখনো নিআমত ছিনিয়ে নেন। কখনোবা শাস্তি দিয়ে ওই ব্যক্তি বা জাতিকে ধ্বংসও করে দেন।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যতসব নিআমত আমরা ভোগ করে থাকি, এর কিছু তো এমন, যেখানে বান্দার করণীয় কিছুই থাকে না, তার কোনো চেষ্টা বাহ্যিক কারণ হিসেবেও বিবেচিত হয় না। যেমন, কেউ কোনো খ্যাতিমান বংশের সন্তান। এটা একান্তই তার ওপর তার প্রভুর দয়া। এর পাশাপাশি কিছু নিআমত এমন, যেখানে বাহ্যত বান্দার চেষ্টাও সঙ্গে থাকে। পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল করল, তো সেখানে বাহ্যিক কারণ হিসেবে ওই পরীক্ষার্থীর সাধনা ও অধ্যাবসায়কে বিবেচনায় আনা হয়। তার মেধাকে বিবেচনায় আনা হয়। যদিও এগুলোও আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। কথা কী, নিআমত এই দুই প্রকারের যে কোনোটিই হোক, সব নিআমতকেই আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবেই গণনা করতে হবে। নিজের চেষ্টা সাধনা যোগ্যতা পরিশ্রম ত্যাগ–যতকিছুই এর সঙ্গে থাকুক না কেন, বিশ্বাস করতে হবে–এগুলো সবই খোলস মাত্র। আসলে সবই আল্লাহর দান। যে কোনো নিআমত সামনে রেখে কেউ যখন এভাবে ভাবতে শিখবে, অভ্যস্ত হবে, তখন সে নিআমতে তার আনন্দ প্রকাশের মধ্যেও থাকবে মহান আল্লাহর প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ছাপ। এর ব্যত্যয় হলেই হারিয়ে যাবে বিনয় ও কৃতজ্ঞতাবোধ। নিআমতকে যদি কেউ নিজের অর্জন মনে করে, নিজের যোগ্যতার স্মারক মনে করে, কিংবা নিজের অধিকার মনে করে পুলক অনুভব করে, উল্লসিত হয় তাহলে এটাই হবে উজ্ব বা আত্মমুগ্ধতা। আত্মমুগ্ধতায় বিনয় ও কৃতজ্ঞতাবোধের ছোঁয়া থাকে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন উল্লাস থেকে বারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের বাণী–

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ.

তুমি উল্লসিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ উল্লসিতদের ভালোবাসেন না। –সূরা কাসাস (২৮) : ৭৬

যে কোনো নেক আমল করতে পারা আল্লাহ তাআলার নিআমত। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারা আল্লাহ তাআলার নিআমত। এই যে আমরা পড়ি– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ), এর অর্থই তো হচ্ছে–ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। তিনি চাইলেই এবং দয়া করলেই কেউ কোনো ভালো কাজ করতে পারে; কোনো মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। তাই এ নিআমত যখন কেউ লাভ করে, কোনো ভালো কাজ যখন কেউ সম্পাদন করে, কিংবা কোনো মন্দ কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যখন কেউ তা এড়িয়ে যেতে পারে, তখন একে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার নিআমত বিবেচনা করা উচিত। এ নেআমতের কথা মাথায় রেখে কেউ যখন ভাববে, আমি একটি ভালো কাজ করতে পারলাম, তখন সে কৃতজ্ঞতার সিজদায় লুটিয়ে পড়বেই। হাদীস শরীফে তো কৃতজ্ঞতাসুলভ এ আনন্দকে ঈমানের আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। –হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল–ঈমান কী জিনিস? তিনি উত্তরে বললেন–

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

তোমার ভালো কাজ যখন তোমাকে আনন্দিত করবে আর তোমার মন্দ কাজ যখন তোমাকে পীড়া দেবে তখনই তুমি মুমিন। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২১৬৬

হাদীসের মর্ম তো সহজ–নামায যখন কেউ আদায় করবে, তখন সে নামায আদায় করতে পেরে আনন্দিত হবে। রোযা রাখতে পেরে আনন্দিত হবে। একজন অসহায়ের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পেরে আনন্দিত হবে। আর এসবের সঙ্গেই থাকবে আল্লাহ তাআলার প্রতি

কৃতজ্ঞতাবোধ–তিনিই দয়া করে আমাকে দিয়ে এ কাজটি করিয়েছেন। তিনি তাওফীক না দিলে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হতো না। এভাবে যখন কেউ ভাবে আর মনে মনে আনন্দিত হয় তখন এ আনন্দ ঈমানের আলামত হয়। কিন্তু মুমিন যখন তার ভালো কাজগুলোকে নিজের অর্জন বিবেচনা করে, নিজের প্রাপ্তি ও অধিকার মনে করে, তখন সে হয়ে পড়ে খাতাকলমের মুমিন। উজ্ব ও আত্মমুগ্ধতার শিকার হয়ে সে ছিটকে এসে দাঁড়ায় মুমিনের খোলসদের কাতারে। আর বান্দা যখন নিআমত পেয়ে কৃতজ্ঞতায় নতশির হয় না, মনের গভীর থেকে বিনয়ের সঙ্গে তার মুখ থেকে 'আলহামদু লিল্লাহ' উচ্চারিত হয় না, তখন এ নিআমত তার আর নিআমত থাকে না। আল্লাহ তাআলার কী দীপ্ত ঘোষণা–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ.

যদি তোমরা আমার (নিআমতের জন্যে) কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহলে সন্দেহ নেই, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৭

আসলে এ কৃতজ্ঞতাবোধও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক প্রকার নিআমত। তাই তো পবিত্র কুরআনেই আমাদের এ দুআ শেখানো হচ্ছে–

رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ...

প্রভু আমার! আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আমি আপনার ওইসব নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে দান করেছেন, আমার বাবা-মাকে দান করেছেন...। –সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৫

কোনো নিআমত পেয়ে মানুষ যখন কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে উজ্ব ও আত্মমুগ্ধতার শিকার হয়, তখন এর একটি পর্যায় তো এমন, যেখানে বান্দা তার প্রভুর কথা, প্রভুর দয়া ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়। এতটুকু অপরাধের সম্পর্ক কেবলই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে, অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে নয়। কিন্তু কখনো কখনো এই উজ্ব মানুষকে ধীরে ধীরে অহংকারের দিকেও নিয়ে যায়। সে তখন ভাবতে থাকে–এই যে আমার এত বিদ্যা-বুদ্ধি, কাড়ি কাড়ি অর্থসম্পদ, হৃদয় জুড়ানো সন্তান-সন্ততি, বাড়ি গাড়ি আরও কত কী! আমার মতো এমন আর কে আছে? আমার মতো এত সুন্দর করে কথা বলার মতো কেউ আছে? আমার চেয়ে সঠিক ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দিতে পারে সে কে? এভাবেই জন্ম নেয় অহংকার। আর অহংকার যে পতনের মূল–তা কি নতুন করে বলার বিষয়!

বিষয়টি আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি। নিজেকে নিয়ে কেউ যখন অহংকার করে তখন তো নিজের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েই অহংকার করে। অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। ঠিক যেভাবে ইবলিস শয়তান আগুনের তৈরি বলে নিজেকে মাটির তৈরি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। এই বিবেচনায় ওপরের কথাটি আরেকটু বাড়িয়ে বলা যায়–অহংকার পতনের মূল, আর উজ্ব ও আত্মমুগ্ধতা অহংকারের মূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্বের এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির বিষয়ে আমাদের এভাবে সতর্ক করেছেন–

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

তিনটি বিষয় মারাত্মক ধ্বংসাত্মক : এক. অত্যধিক কৃপণতা দুই. প্রবৃত্তির অনুসরণ তিন. নিজেকে নিয়ে মুগ্ধতা। –শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৭৩১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৫৪৫২

নিজের গুণে মুগ্ধ হয়ে পড়লে মানুষের অগ্রসরতা থেমে যায়। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে পড়ে। দ্বীন-দুনিয়া-পরকাল–সর্বক্ষেত্রেই এ মুগ্ধতা মানুষকে পিছিয়ে দেয়। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন–

الهلاك في اثنتين ، القنوط والعجب.

মানুষ দুই কারণে ধ্বংস হয়–এক. নৈরাশ্য, দুই. নিজেকে নিয়ে মুগ্ধতা। –ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, পৃ. ১২৯৩

কারণ মানুষের সফলতার জন্যে যে চেষ্টা অনিবার্য, নিরাশ ও আত্মমুগ্ধ–উভয়েই সে চেষ্টা ছেড়ে দেয়। নিরাশ যে, সে যেমন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস হয়, একইভাবে যে নিজের প্রতি মুগ্ধ, সেও ভাবে–আমি তো সফল হয়েই গেছি। আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। এখন আমিই সেরা। এই ভাবনা তাকেও চেষ্টা ও সাধনা থেকে বিরত রাখে। একসময় সেও ধ্বংস হয়।

এই মুগ্ধতা যে কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে এর একটি নমুনা দিই। ঘটনাটি চৌদ্দশ বছর আগের। তবুও তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হওয়ার কারণে যেন আমাদের কাছে তা চিরনতুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরত পরবর্তী অষ্টম বছরের কথা। সে বছর তিনি মক্কা বিজয় করেন। মক্কা বিজয়ের পর, মক্কায় থাকাকালেই শুনতে পান–হাওয়াযিন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা তীরন্দাজিতে খুবই বিখ্যাত ছিল। তখন তিনি বার হাজার সাহাবীর বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শত্রুসংখ্যা মাত্র চার হাজার। এই প্রথমবারের মতো মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা এত বেশি। তাও আবার শত্রুপক্ষের তুলনায় তিনগুণ। নিজেদের এই সংখ্যাধিক্য দেখে সাহাবীদের কেউ কেউ ভাবল–'বদরে-খন্দকে আরও কত কম সৈন্য নিয়ে আমরা বিজয়ী হয়েছি। সেখানে শত্রুসংখ্যাও ছিল আমাদের চেয়ে বেশি। আর এখানে তো আমাদের রয়েছে বিশাল বাহিনী। আবার শত্রুরা সংখ্যায় আমাদের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। বিজয় তো এখানে আমাদেরই!' যারা এভাবে ভাবছিল, তারা আগের বিজয়গুলোতে আল্লাহর সাহায্যের কথা ভুলে গিয়েছিল। এ ভাবনাটি আল্লাহ পছন্দ করেননি। তাই হোঁচটস্বরূপ তাদের একটু পরীক্ষায় ফেললেন। যুদ্ধ যখন শুরু হল, একপর্যায়ে দেখা গেল, যুদ্ধের মাঠে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুটিকয়েক সাহাবী নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য সবাই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের মোড় আবারও ঘুরিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এমন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনেও, যখন তোমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতপর আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল। –সূরা তাওবা (৯) : ২৫-২৬ ●

মাসিক আলকাউসার ২০০৫-২০১৭

কোন্ ভলিউমে কী আছে

আলহামদু লিল্লাহ! মাসিক আলকাউসার-এর শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৩ বছরের (২০০৫/২০০৬/২০০৭/২০০৮/২০০৯/২০১০/২০১১/২০১২/২০১৩/২০১৪/২০১৫/২০১৬/২০১৭) ভলিউম পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহী পাঠকের সুবিধার্থে প্রতিটি বছরের আলাদা আলাদা ভলিউমে মুদ্রিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের তালিকা তুলে ধরা হল। প্রতিটি ভলিউম ২৪০/=

ভলিউম-২০০৫

* গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা
* মুহাররম ও আশুরা : ফযীলত, করণীয় ও বর্জনীয়
* উমরী কাযা : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
* ফকীহগণের মতভেদ : একটি মূল্যায়ন
* সফর মাস : প্রচলিত কুসংস্কার ও সময়ের শুভ-অশুভ
* আকীদা বিশুদ্ধ করা সর্বপ্রথম ফরয
* ত্রিত্ববাদ ও ঐশীগ্রন্থ নির্ণয়ে খ্রিস্টানদের একাধিক কাউন্সিল
* জুমআর খুৎবা কোন ভাষায় হওয়া চাই
* বাইবেলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায কীভাবে আদায় করেছেন?
* মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি
* টেস্টটিউব সন্তান : ইসলাম কী বলে?
* মেরাজ : কিছু তত্ত্ব, কিছু শিক্ষা ও কিছু ভুল ধারণার সংশোধন
* শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্লোনিং
* মাহে রজব : করণীয় ও বর্জনীয়
* নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. রচিত সিলসিলা ... একটি পর্যালোচনা
* বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত
* দেশী-বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ও স্থানান্তর
* তারাবীর গুরুত্ব, ফযীলত ও রাকাত সংখ্যা
* যাকাত : তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও মৌলিক নির্দেশনা
* সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায
* আহলে হাদীস আলেমগণ যদি ভেবে দেখতেন?
* হজ্ব আদায়ে বিলম্ব : কিছু অহেতুক কারণ

ভলিউম-২০০৬

* যিলহজ্ব মাস : ফযীলত ও করণীয়
* মাসায়েলে কুরবানী
* সাধারণ মোজায় মাসেহ সহীহ হবে কি?
* প্রার্থনা মাযারওয়ালার কাছে নয়, আল্লাহর কাছে করুন এবং মাযারওয়ালার জন্য করুন
* পশ্চিমাদের প্রতারণার বড় হাতিয়ার 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' ও 'মানবাধিকার', মাওলানা তাকী উসমানীর একটি সাক্ষাৎকার
* অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যায় কি?
* নামাযের কাতার সোজা করা ও মিলেমিলে দাঁড়ানোর সঠিক নিয়ম : কিছু দৃষ্টিকটু বাড়াবাড়ি
* মেডিকেল টেস্ট ডাক্তারদের কমিশন ও প্রসঙ্গ কথা : শরয়ী দৃষ্টিকোণ
* কালিমা তাইয়েবা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাব
* এখনো জোনাকি জ্বলে
* রজব, মেরাজ ও শবে মেরাজ : কিছু কথা
* মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিতে ফিকহ ও ফুকাহা
* উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত
* মক্তবের কায়েদা ও ইসলামী কালেমা : একটি পর্যালোচনা
* ফযীলতপূর্ণ দিবস ও ফযীলত বিষয়ক হাদীস, সতর্কতা ও সচেতনতা খুবই প্রয়োজন
* আমার উপর কি হজ্ব ফরয হয়েছে বা আমার হজ্ব কি বিলম্বিত হচ্ছে?
* ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ও প্রাসঙ্গিক বিষয় : শরয়ী দৃষ্টিকোণ
* কাদিয়ানী বিশ্বাসে কালিমা তাইয়েবার অর্থ
* আমরা হজ্ব আদায়ে যেসব ভুল-ভ্রান্তির শিকার হই

ভলিউম-২০০৭

* কুরবানী আদায়ে যেসব ভুলক্রটি হতে দেখা যায়
* সালাফের বক্তব্যে তাকলীদ ও মাযহাব শব্দের ব্যবহার
* নবজাতককে কেন্দ্র করে যেসব ভুলভ্রান্তি হতে দেখা যায়
* মওলুদখানী : হক্ব আদায়েরর না-হক পন্থা
* বিদআত : কিছু যুক্তি ও পর্যালোচনা
* আলবায়্যেনাত-এ প্রকাশিত মওজু রেওয়ায়েত: আরও তথ্য ও পর্যালোচনা
* সাধারণ মানুষের জন্য কি দলীলসহ মাসআলা জানা জরুরি
* কুরআনের একটি আয়াতে কতক গাইরে মুকাল্লিদ আলিমের তাহরীফ
* আহলে কিতাব নারীকে বিয়ে করা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর
* তীজা দাহম চেহলাম প্রসঙ্গ
* ফিকহে হানাফীর সনদ
* প্রসঙ্গ : ফাতেহায়ে ইয়াযদহম
* মায়ের দুধ পান করানো সংক্রান্ত ভুলক্রটি
* দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য মাদরাসার অস্তিত্ব জরুরি
* ইসলামের নামে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমিতি সোসাইটি এনজিও ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের বিনিয়োগ পলিসি : একটি পর্যালোচনা
* অজ্ঞতা ও রসম-রেওয়াজের কবলে শাবান-শবে বরাত
* হজ্ব সফরনামা=বাইতুল্লাহর মুসাফির (শুরু : আগস্ট ০৭-শেষ : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ০৯)
* সহীহ হাদীসের আলোকে মিরাজুন্নবীর ঘটনা
* রমযান ও ঈদের চাঁদ : কার দায়িত্ব কী
* সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ আসলে কত?
* হজ্বের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ও জরুরি মাসায়েল
* নবী-নামের প্রতি সম্মান ঈমানের অংশ
* ভোটার তালিকা ও মহিলাদের ছবি : শরয়ী দৃষ্টিকোণ

ভলিউম-২০০৮

* সাত ক্বারী চৌদ্দ রাবী : একটি আলোচনা
* মোবাইল ফোন : প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* 'নারী উন্নয়ন নীতি' এবং এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও প্রচারমাধ্যমের অসত্য প্রচারণা
* তাসাউফ সম্পর্কে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতা
* শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন
* সোসাইটির নামে দালালিভিত্তিক কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি ও ফিকহে ইসলামীর আলোকে বিশ্লেষণ ও শরয়ী সমাধান
* সম্মিলিত দুআ : একটি প্রশ্নের উত্তর
* তারাবীহ বিষয়ক দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর
* যাকাত : গুরুত্ব ও মাসায়েল
* দ্বীন হেফাযতের মৌলিক কাজ সুন্নাহর প্রতিষ্ঠা ও বিদআতের প্রতিরোধ
* ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর
* কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুরবানী
* নির্বাচন ও ভোট : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
* আমিও বলি কোথায় যাব, কার কাছে যাব

ভলিউম-২০০৯

* সুন্নাহসম্মত নামায : কিছু মৌলিক কথা (শুরু : জানুয়ারি ০৯-শেষ : মে ০৯)
* হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উছমানী-এর ঢাকা সফর, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের সারসংক্ষেপ
* ইসলামী ব্যাংকিং : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা-২
* স্কুল-কলেজের ইসলামিয়াতের সিলেবাস : একটি পর্যালোচনা
* একান্ত সাক্ষাৎকার : 'আমরা পরাজিত হলেও প্রতারিত যেন না হই' —মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
* সালিশ, হদ, তা'যীর, ফতোয়া বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার
* হাদীছ ও আছারের আলোকে রমযান : ফাযাইল ও মাসাইল
* হজ্ব বিষয়ক ভুল-ভ্রান্তি
* প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা : সমাজ ও বাস্তবতার আলোকে
* শাআইর ও ইবাদাত : কিছু প্রয়োজনীয় কথা
* গান ও বাদ্যযন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ভলিউম-২০১০

* ফিকহে হানাফী : কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য
* প্রণীত শিক্ষানীতি ২০০৯ : কথা তো শেষ

হওয়ার নয়
* সাক্ষাৎকার : বলা যায় আদর্শিক প্রশ্নে হাত দেওয়ায় ৫ম সংশোধনী
* বাইতুল্লাহর ছায়ায় (শুরু : ফেব্রুয়ারি ১০-শেষ : নভেম্বর ১২)
* জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে
* হালাল-হারামের দৃষ্টিতে বর্তমান শেয়ারবাজার ঝুঁকিপূর্ণ
* বিতর নামায আদায়ের পদ্ধতি : একটি প্রশ্নের উত্তর
* হাদীস ও আছারের আলোকে বিতর নামায
* ফাতওয়া, কাযা, হুদুদ ও তা'যীর : পরিচিতি ও কিছু মৌলিক বিধান
* মাযার ও ওরস : কিছু প্রয়োজনীয় কথা
* তোমরা কে? তোমরা কী? তোমাদের গন্তব্য কোথায়?
* যবীহুল্লাহ কে -এ প্রশ্ন কেন?
* ঐক্য ও সংযমের ইবাদতে কেন এত অনৈক্য ও অসংযম
* জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতা
* হজ্ব-উমরার আমলসমূহ : মর্তবা ও ফযীলত
* আশুরা ও মুহাররম : কিছু কথা
* শরীয়তের ফরজ ও সালাফের তা'আমুল, লেবাস-পোশাকে নাহি আনিল মুনকার
* বাবরি মসজিদ (শুরু ডিসেম্বর ১০)

ভলিউম-২০১১

* একটি সরল মূল্যায়ন : কুরআন-সুন্নাহ থাকতে মাযহাব কেন
* শেয়ার বাজার : প্রসঙ্গ কথা
* দুরূদ শরীফ স্বতন্ত্র ইবাদত : একে রসম বানাবেন না
* অন্যায় সালিশ, গর্হিত প্রচারণা
* 'আমাদের পরিবার যেন হয়ে ওঠে নারী-অধিকার ও নারী-মর্যাদা রক্ষার আদর্শ অঙ্গন
* আস্তে আমীন, জোরে আমীন
* পয়লা বৈশাখ : এখন যেমন
* প্রসঙ্গ নারী উন্নয়ন-নীতি
* কুরআনে নারীর অধিকার : প্রসঙ্গ মোহর
* কুরআনে নারীর অধিকার : প্রসঙ্গ মিরাছ
* যৌতুক : এক অভিশপ্ত সামাজিক ব্যধি, বহু কবীরা গুনাহর সমষ্টি
* নারীর নাফাকা ও পরিপোষণ : বিধান ও কল্যাণ
* যৌতুক : কনের অশ্রু, বরের উল্লাস
* যৌতুক : উৎপত্তি, বিস্তার ও ভয়াবহতা
* সাদাকাতুল ফিতর; আধা সা গম : হাদীস ও সুন্নায়, আছার ও ইজমায়
* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নারীর জিজ্ঞাসা ও নারীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা (শুরু সেপ্টেম্বর ১১)
* শিরক উচ্ছেদকারী সাধকের কবর শিরক-ওরসের কেন্দ্র হতে পারে না
* নফল হজ্ব কখন করব, কীভাবে করব
* বদলী হজ্বের মাসায়েল
* ওয়ালস্ট্রিট দখল-আন্দোলন পুঁজিবাদের পতন-ঘণ্টা ও আমাদের নিষ্ক্রিয়তা
* সাবধান ! উদারতার অর্থ বিশ্বাসের বিসর্জন নয়
* নামাযে হাত বাঁধা ও নাভীর নিচে বাঁধা
* নারীর গৃহে অবস্থান : পরাধীনতা নয়, মৌলিক অধিকার
* মুসলিম রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা

ভলিউম-২০১২

* মাল্টিলেভেল মার্কেটিং
* জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ.-এর খাসাইসুল কুবরা একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
* তাবলীগী জামাতসমূহের প্রতি বিদায়ী হেদায়েত ও নির্দেশনা
* নবী-আদর্শের অনুসরণে মর্মান্তিক অবহেলা, বড় বড় সুন্নত পরিত্যক্ত, বহু সুন্নত নিষ্প্রাণ এর পরও ঈমান ও মহব্বতের দাবি! (শুরু : মার্চ ১২-শেষ : জুন ১২)
* আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য
* ওয়াহদাতুল উম্মাহ ওয়াত্তিবাউস সুন্নাহ- উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা (শুরু : এপ্রিল ১২-শেষ : নভেম্বর ১২)
* যে কারবারগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ সেগুলোর পতন বাস্তবেও অবশ্যম্ভাবী
* বরাহে করম! রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিবাদ ছাড়ুন, নিজ নিজ ত্রুটি সংশোধন করুন
* আল্লাহর বিধানে সংশোধন!
* কুরআন কীভাবে বুঝব
* দরসে তাওহীদ (শুরু সেপ্টেম্বর ১২)
* রোহিঙ্গা : অশ্রুভেজা মুসলিম মুখ
* খ্রিস্টধর্ম না পৌলবাদ (শুরু : নভেম্বর ১২-শেষ : মে ১৩)
* কারবালা : প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত
* কাবলাল জুমা : কিছু নিবেদন
* ফযীলতপূর্ণ দিবস-রজনী : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ভলিউম-২০১৩

* বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড : ইসলাম কী বলে
* দাম্পত্যজীবন, অজ্ঞতা ও পরিণাম
* দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর; ইয়াওমে আরাফার রোযা ও কুরবানীর সাথে আকীকা
* ইমাম আবু হানিফা রাহ. হাফিযুল হাদীসও ছিলেন; একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর
* ঈমান সবার আগে (শুরু : মার্চ ১৩-শেষ : মে ১৩)
* অমুসলিম, অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহীর জানাযা ও দাফন; একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর
* মদীনা রাষ্ট্র না মানার কারণে নয়, বনু কুরাইযাকে পাকড়াও করা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকার কারণে
* ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা
* চেয়ারে বসে নামায : একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর (দারুল উলূম করাচী-এর নতুন ফতোয়ার আলোকে)
* অমর বালাকোট-সংগ্রামী নোয়াখালীর মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী রাহ.
* মদীনা সনদ
* কাদিয়ানী সম্প্রদায় কেন মুসলমান নয় (শুরু : মে ১৩-শেষ : মার্চ ১৪)
* 'বাঙালী না মুসলমান'?
* বালাকোট থেকে মতিঝিল
* হেফাযতে ইসলাম ও ওহাবী-সুন্নী হযবরল
* প্রসঙ্গ : রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থায় ইসলাম
* সংবিধান যখন অজুহাত
* মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন, একইদিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন (শুরু : আগস্ট ১৩)
* হযরত মাদানী রাহ. কক্ষনো ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন না
* ইসলামে মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের গুরুত্ব (শুরু সেপ্টেম্বর ১৩)
* মোবাইল ব্যাংকিং : পর্যালোচনা ও শরঈ দৃষ্টিকোণ
* কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল
* পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ : কয়েকটি বাহন
* হাদীসে কি টুপির কথা নেই?
* দরসে তাওহীদ : তাওহীদের চার প্রতিপক্ষ

ভলিউম ২০১৪

* অনর্থক আলোচনা-মন্তব্য রেখে ইসলাহ ও দুআর প্রতি মনোযোগী হই
* পার্বতীপুর : মুন্সিবাড়ির লোকেরা যেখানে খ্রিস্টান
* ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান ও ইসলাম
* ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকলেই সাম্প্রদায়িকতা!
* সেই পায়ের একটুখানি ধূলোর জন্য
* ঈমান বিল আখিরাহ
* বাংলা ভাষায় পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ
* ৫ ও ৬ মে : নিবেদনের পাঠশালা
* রোযা ও যাকাত : গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা
* একটি বই, একটি চিঠি (শুরু : আগস্ট ১৪)
* তুরস্কে, তুর্কিস্তানের সন্ধানে (শুরু : সেপ্টেম্বর ১৪ শেষ : সেপ্টেম্বর ১৫)
* ব্লাসফেমী কেন দরকার
* দুআ : কিছু শর্ত ও কিছু আদব
* আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস : প্রেক্ষাপট ও করণীয়
* দ্বীনের সমঝ কাকে বলে?
* মানুষ এক আদিমাতার সন্তান : একটি গবেষণা ও কিছু কথা

ভলিউম ২০১৫

* সীরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা
* আল্লাহর ডাকে লাব্বাইক বলুন
* শার্লির ধৃষ্টতা ও দুঃখ : গোড়ায় হাত দিন
* একটি বই, একটি চিঠি : মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত
* সূরা ফাতেহা কি কেরাত নয়?
* নেফাসের সময়সীমা : একটি প্রশ্ন ও উত্তর
* দুই আদর্শ, দুই জাতি
* ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামী : মাইজবাড়ির মিয়াঁ ছাহেব রাহ.

* সুদ কি 'রিবা' নয়?
* উলামায়ে কিরাম ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে সেতুবন্ধন : চাই মধ্যপন্থী ভাবনার চর্চা
* দরসে তাওহীদ : কবরের তওয়াফ, সিজদা ইত্যাদি প্রসঙ্গ
* সালাতুল জানাযায় কি সূরা ফাতিহা জরুরি?
* তাওহীদের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা : দুটি উদাহরণ
* মদের উন্মুক্ত প্রদর্শনী কার স্বার্থে
* কবরের জন্য মান্নত ও নযর-নিয়ায
* সংবাদ-মাধ্যমের রূপরেখা : ইসলামী কাঠামো
* খায়ের-বরকত ও নেক আমলের বসন্ত আছি কেউ কদর করার
* রিবার প্রচলিত কয়েকটি রূপ
* শাস্ত্রীয় আলোচনা
হাদীস: ইমাম যখন পড়ে তোমরা তখন চুপ থাকবে
* জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা : কিছু জরুরি কথা
* দরসে তাওহীদ : কবরে ফুল দেওয়া
* একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার অন্তত ইসলামী আইনে করুন
* হজ্ব : সাক্ষাৎকার
রওযার ছবি তো দিলে ধারণ করবে, ক্যামেরায় নয়
* শাস্ত্রীয় আলোচনা
তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রাফয়ে ইয়াদাইন না করা-প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস
* যিলহজ্ব ও কুরবানী : ফযীলত, গুরুত্ব ও আহকাম
* বাইবেল সংশোধন : কিছু কথা
* প্রসঙ্গ : আকীদায়ে হায়াতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
* এক ধর্মের উৎসব অন্য ধর্মের জন্য নয়
* গণমাধ্যম না গোত্রমাধ্যম!
* হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন
* শাস্ত্রীয় আলোচনা
হাদীস : 'যে ইমামের পেছনে নামায পড়ে ইমামের কেরাতই তার কেরাত'
* ইলম অর্জনের পদ্ধতি : কিছু প্রয়োজনীয় কথা

ভলিউম ২০১৬

* বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে হামলা প্রসঙ্গ
* সন্তানের শিক্ষায় অতিউৎসাহও নয় বাঞ্ছনীয়
* আরবের আলেমগণ কি মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধী?
* দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা.-এর মূল্যবান ভাষণ
* সিজদায় দুই বাহু বিছিয়ে দেয়া
* করযে হাসানা : কিছু নির্দেশনা
* 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' একটি চিঠি ও তার উত্তর
* নাটোরে কয়েকদিন
* জানাযার নামাযে হামদ ও ছানা
* আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ আলবানী রাহ.
শায়েখ শুআইব আরনাউতের দৃষ্টিতে
* শাস্ত্রীয় আলোচনা : ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের সহীহ হাদীস
* বাজেট ২০১৬-১৭ : কিছু কথা
* প্রফেসর আব্দুস সামাদ সারেম রাহ.-এর আয়াতসংখ্যার আলোচনা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
* গণমাধ্যমের দুষ্ট প্রভাব : বাঁচবো কীভাবে
* সাক্ষাৎকার
প্রসঙ্গ : গুলশান-হত্যাকাণ্ড
* বেরলভী মতবাদ : ভিত্তিহীন আকীদা ও ভ্রান্ত ধ্যানধারণা.
* এতদঞ্চলে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' : পরিচিতি, মহিমা ও মজলুমি
* মুসলিম উম্মাহর একজন দরদী মানুষ : ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.-কে যেমন দেখেছি
* শরীয়তের মীরাসনীতি অনুসরণ না করার বহুমুখি কুফল
* শাস্ত্রীয় আলোচনা
সেজদা সাহু : পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়
* মার্কিন নির্বাচনে নারী-প্রসঙ্গ
* সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস : মুক্তি কোন্ পথে
* ট্রাম্পের বিজয় : একটি ভিন্ন মূল্যায়ন
* পিতার কর্তব্য : সন্তানকে সময় ও সংগদান
* ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে সীরাতের ভূমিকা
* শায়েখ শুয়াইব আরনাউত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভলিউম ২০১৭

* 'চান্দ্রমাস' বই : একটি পর্যালোচনা : কী দিতে চান সে নিয়েই বিভ্রান্তি
* খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব
* রোহিঙ্গা ইস্যু : মানবিক না ধর্মীয় এ বিতর্ক কেন?
* দ্বীন শিক্ষায় জিজ্ঞাসার গুরুত্ব : শৈথিল্য ও সীমালংঘন
* একটি বই, একটি চিঠি : আযান ও ইকামত
* সমাজ গঠনে সীরাতের ভূমিকা
* দ্বীনী রচনাবলি পাঠ : শৈথিল্য ও সীমালংঘন
* হযরত মাওলানা সালীমুল্লাহ খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
* আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমান
* সাধারণ শিক্ষিত ও আলেম উলামা পরস্পর কাছাকাছি আসা উচিত
* 'নিজেদের হিসাব নিলে দেখা যাবে অনেক ফরযে আইন ইলম এখনো শেখা হয়নি'
* অমঙ্গলের পথে শোভা-যাত্রা?
* গোল্ডেন রেশিও এবং কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না– এ প্রসঙ্গ
* 'দ্বীনের উপর চলা এবং আল্লাহর বিধান মানা বর্তমান সময়েও সম্ভব'.
* 'ফরযে আইন ইলম শেখা ছাড়া ঈমান শেখা হয় না'
* কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি
* সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চান্দ্রমাসের সূচনা : একই দিনে রোযা ও ঈদ
* আহলে ইলমের পরামর্শ ও সংশোধনী গ্রহণ দ্বীনী কাজের রক্ষাকবচ
* ঈসালে সওয়াব : কিছু মাসনূন পদ্ধতি
* হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নোমানী রাহ.
* পৈতৃক মীরাছ ও যৌতুক
* ঈসালে সওয়াব : কিছু মুবাহ পদ্ধতি
* প্রসঙ্গ : আলকুরআনের অর্থ বোঝা
* শ্রেষ্ঠ বিয়ে?!
* ইবাদতের তাৎপর্য : কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা
* একটি বই, একটি চিঠি : কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি
* ঈসালে সওয়াব : কিছু রসম-রেওয়ায ও মনগড়া পদ্ধতি
* বিবাহ-বিচ্ছেদ নয়
* কুরআন-বর্ণিত ইঞ্জিল ও প্রচলিত ইঞ্জিল
* আদাবুল ইস্তিঞ্জা : দুটি মাসআলার দালীলিক বিশ্লেষণ
* জ্যোতির্বিজ্ঞানে মধ্যযুগের মুসলমানদের অবদান (সেপ্টেম্ব : ১৭-জানু : ১৮)
* রক্ত ঝরছে, আগুন জ্বলছে আরাকানের মুসলিম জনপদে
* বার্মার আরাকান রাজ্য ও রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস : আমাদের কর্তব্য
* রোহিঙ্গা মজলুমানের মিছিল
* প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা মুসলমান : পরিস্থিতি ও করণীয়
* রোহিঙ্গা শিবিরে মসজিদ প্রতিষ্ঠা কেন
* ইকবালের কাব্যে নারী
* ফজরের জামাত চলা অবস্থায় সুন্নত পড়া
* সীরাত : মানব জীবনের সর্বোত্তম নমুনা
* সাক্ষাৎকার : 'মূল বিষয় হল মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো'
* বেলফোর ঘোষণার শতবর্ষপূর্তি উদ্যাপন

প্রচলিত ভুল

একটি অলীক কাহিনী

জিবরীল আ.-এর জান্নাত মাপার কাহিনী

লোকমুখে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে, 'একবার জিবরীল আলাইহিস সালামের জান্নাত মেপে দেখার ইচ্ছা হল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি চাইলেন। আল্লাহ অনুমতি দিলেন। জিবরীল আলাইহিস সালামের ডানা আসমান থেকে যমীন সমান। তো এই ডানা দিয়ে তিনি জান্নাত পরিমাপ করার জন্য উড়তে আরম্ভ করলেন। উড়তে উড়তে এক পর্যায়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন এবং তাঁর ডানা ভেঙে গেল, অচল হয়ে গেল। তিনি থেমে গেলেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল তুমি তো এখনো জান্নাতের এক খুঁটি (বা চৌকাঠ) থেকে আরেক খুঁটি পর্যন্তও পৌঁছতে পারনি।'

কেউ কেউ এভাবেও বলে, '...জিবরীল আলাইহিস সালাম অনুমতি চাইলে আল্লাহ অনুমতি দিলেন। তিনি তিনশত বছর চললেন। তারপর আবার আল্লাহর কাছ থেকে আরো তিনশত বছরের অনুমতি চাইলেন। তিনশত বছর চললেন। তারপর আবার তিনশত বছরের অনুমতি চাইলেন। এভাবে নয়শত বছর চলার পর এক প্রাসাদের সামনে থামলেন। প্রাসাদ থেকে এক হূর উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জিবরীল আমীন! আপনি এখানে কী করছেন? তিনি বললেন, জান্নাত পরিমাপ করছি। হূর বললেন, আপনি নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না। আপনি এই নয়শত বছরে আমার রাজ্যই শেষ করতে পারেননি। জিবরীল আ. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? হূর বললেন, আমি একজন সাধারণ মুমিনের স্ত্রী।'

এগুলো বানোয়াট কিসসা। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো বলা ও বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

জান্নাত কত বড়– এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমের বহু আয়াত রয়েছে। সহীহ হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে জান্নাতের বিশালতা অনুমান করা যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ.

তোমরা একে অন্যের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততা তুল্য। –সূরা হাদীদ (৫৭) : ২১

সহীহ হাদীসে জান্নাতের গাছ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে–

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا.

জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় আরোহী একশ বছর চললেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৫১

এছাড়া সবচেয়ে সাধারণ জান্নাতীর জান্নাতের পরিধি বলা হয়েছে–

مِثْل الدُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا.

দুনিয়া (পৃথিবী) ও তার মত আরো দশ দুনিয়া সমান। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৫৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৬

এসকল আয়াত-হাদীস থেকেই জান্নাতের বিশালতা অনুমান করা যায়। সুতরাং জান্নাতের বিশালতা বোঝানোর জন্য আমরা এসকল আয়াত ও সহীহ হাদীস বলব; কোনো অলীক কাহিনী বলব না।

একটি ভুল ধারণা

বানর প্রাণিটি কি বনী ইসরাঈলের বানরে রূপান্তরিত হওয়া মানুষের বংশধর?

বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবারে মাছ শিকার করা নিষেধ ছিল। তারা সমুদ্র-উপকূলের অধিবাসী হওয়াতে মাছ শিকার করা ছিল তাদের প্রিয় কাজ। এদিকে অন্যান্য দিনের তুলনায় শনিবারে সমুদ্রকূলে মাছ আসত বেশি। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মাছ শিকার করতে থাকে। এতে আল্লাহ ওদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের উপর বানর ও শুকরে রূপান্তরিত হওয়ার আযাব নেমে আসে।

এ থেকে কারো কারো মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, বানর জাতি সেই বিকৃত বনী ইসরাঈলেরই বংশধর। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

মানুষ ও বানর আল্লাহ তাআলার ভিন্ন দুটি সৃষ্টি। বানর মানুষ ছিল না এবং মানুষও বানর ছিল না। এরা সম্পূর্ণ পৃথক দুটি প্রজাতি। আল্লাহ তাআলা আযাব স্বরূপ কিছু মানুষকে বানর-শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। রূপান্তরিত বানর পৃথিবীতে বংশবিস্তার করেনি। সেই অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং বানর স্বতন্ত্র একটি প্রজাতি; বিকৃত ও রূপান্তরিত কোনো প্রজাতি নয়।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর রাসূল! আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত সম্প্রদায়?

নবীজী উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আকৃতি রূপান্তরিত করেন তখন তাদের বংশ বিস্তার হয় না। অর্থাৎ তারা রূপান্তরিত অবস্থায়ই ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি আরো বললেন, বানর ও শুকর তো পৃথিবীতে আগেও ছিল। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৬৩

একটি অনুচিত কাজ

খবরের কাগজের টুকরা দিয়ে হাত মোছা

অনেক হোটেলে খাবারের পর হাত মোছার জন্য খবরের কাগজের টুকরা রাখা থাকে এবং মানুষ তা দিয়ে খাবার শেষে হাত মোছে। এটি একটি অনুচিত কাজ।

কাগজ ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর যথাযথ সম্মান করা কর্তব্য। তাই খবরের কাগজের টুকরা হোক বা বইয়ের পাতা– তা হাত মোছার কাজে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

তেমনিভাবে খবরের কাগজের টুকরা পা দিয়ে মাড়াতেও দেখা যায়। এটিও বর্জনীয়। রাস্তায়-চলার পথে খবরের কাগজ হোক বা যে কোনো কাগজ, তা মাড়ানো ঠিক নয়। পথে কাগজ দেখলে তা না মাড়িয়ে হেফাজত করা চাই বা এমন জায়গায় সরিয়ে রাখা চাই, যেখানে রাখলে আর পায়ের তলে পড়ার আশংকা থাকে না।

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল, যেখানে-সেখানে কাগজ না ফেলা এবং সাধারণ আবর্জনা আর কাগজ একত্রে না রাখা। বরং কাগজের জন্য আলাদা ঝুড়ি বা কোনো ব্যাগ থাকা চাই, যেখানে শুধু কাগজ রাখা হবে। ●

আপনি যা জানতে চেয়েছেন

ফতোয়া বিভাগ : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

তাহারাত-পবিত্রতা

আবদুল্লাহ মাকতুম
ফরিদপুর

৪৩২১ প্রশ্ন : কিছুদিন ধরে এ বিষয়টি আমার অভ্যাসের মত হয়ে গেছে যে, অযু শেষ করে হাত বাঁকিয়ে কনুইয়ের দিকে তাকাই। কনুইয়ের উপরের অংশে কোথাও শুকনো দেখলে নতুন পানি না নিয়েই আশপাশের পানি দিয়ে ডলে ঐ জায়গা ভিজিয়ে দেই।

জানতে চাই, এভাবে আমার অযু সহীহ হচ্ছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণে আপনার বিষয়টি ওয়াসওয়াসা তথা অমূলক সন্দেহ বলে মনে হচ্ছে। যদি সন্দেহ হয় তাহলে জেনে রাখা দরকার যে, এ ধরনের সন্দেহ ধর্তব্য নয়। তাই আপনার কর্তব্য হল, অযুর সময়ই কনুইসহ হাত ভালোভাবে ডলে ধুয়ে নেয়া। এভাবে ডলে ধুয়ে নিলে পরে আবারও কোথাও শুকনা আছে কি না তা দেখার প্রয়োজন নেই। অবশ্য কখনো যদি অযুর কোনো অংশ বাস্তবেই শুকনা থাকে তাহলে ওভাবে শুধু আশপাশের পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিলে অযু সহীহ হবে না; বরং ভিন্ন পানি নিয়ে ঐ অংশ ধুয়ে নিতে হবে। –খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৮; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৫; হালবাতুল মুজাল্লী ১/৪৬; রদ্দুল মুহতার ১/১৫৯

আবদুল আহাদ
সিলেট

৪৩২২ প্রশ্ন : একদিন আমি একটা দ্বীনী মাহফিলে গিয়েছিলাম। তো নামাযের বিরতিতে অযুখানায় গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ভীড়। এরই মাঝে এক লোক একটা মগ নিয়ে এসে তাতে পানি নিল, তারপর তাতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে নিয়ে অযু শেষ করল। তো জানার বিষয় হল এভাবে অযু করা কি ঠিক আছে? এর দ্বারা উক্ত পানি কি ব্যবহৃত হয়ে যাবে না?

উত্তর : অযু করার জন্য পাত্রের ভেতর হাত দিয়ে পানি নিলে তা الماء المستعمل বা ব্যবহৃত পানির হুকুমে হয়ে যায় না। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির অযু সহীহ হয়েছে। তবে যদি হাতে নাপাকী থাকে তাহলে পাত্রের ভেতর হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। অন্যথায় অপবিত্র হাত পাত্রে দিলে পাত্রের পানি নাপাক হয়ে যাবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৯; কিতাবুল আছল ১/২১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/২০৮; আলবাহরুর রায়েক ১/১৬৪-১৬৬; রদ্দুল মুহতার ১/১১২

সালাত-নামায

আবদুল্লাহ
বরিশাল

৪৩২৩ প্রশ্ন : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে না নিম্নস্বরে? অনেকে বলে, ঈদুল ফিতরে নিম্নস্বরে আর ঈদুল আযহায় উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে হয়। উক্ত কথাটি কি ঠিক?

উত্তর : হ্যাঁ, কথাটি সঠিক। ঈদুল আযহায় যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে আর ঈদুল ফিতরে যাওয়ার সময় নিম্নস্বরে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ঈদুল ফিতরে লোকদেরকে উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে শুনে বলেন, মানুষ কি পাগল হয়ে গেল? (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ৫৬৭৬)

এই উক্তি থেকে ঈদুল ফিতরের তাকবীর যে নিম্নস্বরে পড়াই নিয়ম তা প্রমাণিত হয়। আর হানাশ বিন মু'তামির রাহ. বলেন, আমি আলী রা.-কে ঈদুল আযহায় তাকবীর বলতে বলতে ময়দানে আসতে দেখেছি। (সুনানে দারাকুতনী ২/৪৪) –বাদায়েউস সানায়ে ১/৬২৫; আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ২/২৩৫; ফাতহুল কাদীর ২/৪১; ইমদাদুল ফাত্তাহ পৃ. ৫৭৯; রদ্দুল মুহতার ২/১৭০

হাসান আহমাদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৪৩২৪ প্রশ্ন : অনেক সময় ইমাম সাহেব শেষ বৈঠকে থাকা অবস্থায় আমি জামাতে শরীক হই। কখনো কখনো আমি তাশাহহুদ শেষ করার আগেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দেন। এমতাবস্থায় আমার কী করা উচিত? তাশাহহুদ শেষ করে দাঁড়াব, নাকি তাশাহহুদ শেষ না করে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাব?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দেওয়ার পর আপনি তাশাহহুদ শেষ করেই দাঁড়াবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তাশাহহুদ শেষ না করে দাঁড়ালেও নামায হয়ে যাবে। তবে এটি নিয়মসম্মত নয়। তাই এমনটি করা উচিত নয়। –ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/১৯২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৯০; রদ্দুল মুহতার ১/৪৬; ইমদাদুল আহকাম ১/৫৫১

আহমদ রিফাত
শরিয়তপুর

৪৩২৫ প্রশ্ন : আমার বড় ছেলের বয়স বার বছর। দশ বছর বয়স থেকেই ও নামায পড়ে। অল্প কিছু সূরা আর নামাযের অন্যান্য দুআ-দরূদ পারলেও এখনো দুআ কুনূত মুখস্থ করতে পারেনি।

জানতে চাই, ও কীভাবে বিতরের নামায পড়বে? একজন বলেছে, দুআ কুনূতের জায়গায় তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে। এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : প্রসিদ্ধ দুআয়ে কুনূত অথবা এক্ষেত্রে হাদীসে অন্যান্য যে দুআ বর্ণিত আছে তা পড়াই ভালো। তা না জানলে এর জায়গায় رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অথবা তিনবার اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي পড়বে। সূরা ইখলাস যেহেতু দুআ নয় তাই সূরা ইখলাস না পড়াই ভাল।

উল্লেখ্য, দুআ কুনূত না জানলে যত শিঘ্র সম্ভব তা মুখস্থ করে নেয়া উচিত। –আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ২/৮৮; ফাতহুল কাদীর ১/৩৭৫; ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ.১৯; আলমুহীতুল বুরহানী ২/২৭০; রদ্দুল মুহতার ২/৭

আবু হানীফা
নরসিন্দি

৪৩২৬ প্রশ্ন : কখনো কখনো নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি সত্ত্বেও জামাত শুরু হওয়ার পর

প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখনো আমি প্রয়োজন দাবিয়ে জামাতসহ নামায আদায় করি। এতে নামাযের ক্ষতি হবে কি না?
উত্তর : প্রস্রাবের চাপ যদি এত কম হয়, যার কারণে নামাযে খুশু-খুযু বিনষ্ট হয় না, তবে ঐ অবস্থায় নামায পড়া দোষণীয় নয়। কিন্তু যদি চাপ এত বেশি থাকে যে, মনোযোগ সহকারে নামায পড়া কঠিন হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে জামাত ছেড়ে দিয়ে আগে জরুরত সেরে নিবে। এরপর অযু করে একাকী বা জামাতে নামায পড়বে। কারণ বেশি চাপ নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। এতে নামাযের খুশু-খুযু নষ্ট হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.

আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য পেশাবের চাপ থেকে স্বস্তি লাভ করা পর্যন্ত নামায পড়া বৈধ নয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৯১)
অন্য বর্ণনায় এরশাদ হয়েছে—

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ.

নামাযের জামাত শুরু হওয়ার পর তোমাদের কারো শৌচাগারে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সে যেন প্রথমে তা সেরে নেয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৮) —সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬০; শরহে মুসলিম, ইমাম নববী ৫/৪৬; আলবাহরুর রায়েক ২/৩৩; হাশিয়াতুত তহতাবী আলাল মারাকী পৃ.১৯৭; রদ্দুল মুহতার ১/৬৪১

মামুন
নোয়াখালী

৪৩২৭ প্রশ্ন : প্রাণীর ছবি সম্বলিত টি-শার্ট পরে নামায পড়ার দ্বারা নামায সহীহ হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।
উত্তর : যদি টি-শার্টে প্রাণীর ছবি দৃশ্যমান হয় এবং তা ঢাকা না থাকে তাহলে উক্ত টি-শার্ট পরে নামায আদায় করা মাকরূহ হবে। এছাড়া হাফ হাতা জামা বা শার্ট পরে নামায আদায় করা অনুত্তম। —আলবাহরুর রায়েক ২/২৭; আলমাবসূত, সারাখসী ১/২১১; হালবাতুল মুজাল্লী ২/২৯৬; হাশিয়াতুত তহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ১৯৯; রদ্দুল মুহতার ১/৪৫৭

এস এ মালেক
সিলেট

৪৩২৮ প্রশ্ন : আমরা জানি যে, অন্যের হাঁচির জবাব দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল, নিজে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বললে নামায নষ্ট হবে কি না?
উত্তর : নিজে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে নামায নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত নামাযে এমনটি করা ঠিক নয়। নামায সেভাবেই পড়া উচিত, যেভাবে হাদীস-আসারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। —আলমুহীতুল বুরহানী ২/১৪৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১২০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২১৭; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৩৯৩

হাফেজ মুহাম্মাদ আলী
সিলেট

৪৩২৯ প্রশ্ন : আমি এক মসজিদে ইমামতি করি। অনেক সময় রুকুতে যাওয়ার পর কোনো কোনো মুসল্লীর দ্রুতগতিতে মসজিদে প্রবেশের শব্দ শোনা যায়। এমতাবস্থায় আমি যদি উক্ত মুসল্লীর রাকাত পাওয়ার জন্য রুকুতে একটু দেরি করি তাহলে এতে শরয়ী কোনো সমস্যা হবে কি না?
উত্তর : ইমামের কর্তব্য, সুন্নাহসম্মত পন্থায় নামায আদায় করা। কোনো আগন্তুক মুসল্লীর রাকাত পাওয়ার জন্য রুকু কিংবা কেরাত লম্বা করা উচিত নয়। অবশ্য কেউ যদি মুসল্লীদের রাকাত পাওয়ার আশায় কিরাত বা রুকু লম্বা করে থাকে তাহলে এতে নামাযের ক্ষতি হবে না। কিন্তু বিশেষ কোনো মুসল্লীর মনোরঞ্জনের জন্য এমনটি করা জায়েয হবে না। —আলমুহীতুল বুরহানী ২/১১৫; ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়্যা ১/১০৮; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৫৫

হুমায়ূন কবীর
সিলেট

৪৩৩০ প্রশ্ন : সিজদায়ে সাহুর কথা ভুলে গিয়ে দুরূদের কিছু অংশ পড়ে ফেলি। এ ছাড়া কখনো এমন হয় যে, এক নামাযে দুটি ওয়াজিব ছুটে যায়। এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহুর কী হুকুম?
উত্তর : বিশুদ্ধ মতানুসারে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করা নিয়ম। তবে কেউ যদি দুরূদ শরীফ পড়ে সাহু সিজদার সালাম ফিরায় তাহলে সেক্ষেত্রেও তা আদায় হয়ে যাবে।
আর নামাযে একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা একবারই করতে হয়। একাধিক নয়। কেননা নামাযে একাধিক ভুলের কারণে একটি সাহু সিজদাই যথেষ্ট হওয়ার কথা হাদীসে এসেছে। —মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদীস ৪৫৭৩; বাদায়েউস সানায়ে ১/৪১৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৭৩; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৪৭২; কিতাবুল আছল ১/১৯৮; বাদায়েউস সানায়ে ১/৪০৭

ঈসা আবদুল্লাহ
কেরাণীগঞ্জ

৪৩৩১ প্রশ্ন : একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে তাকবীরে তাশরীক নিয়ে কথা হয়। তখন সে বলল তাকবীরে তাশরীক নামাযের পর সাথে সাথেই বলতে হয়। নামাযের পর কোনো কথাবার্তা বলে ফেললে তখন আর তাকবীর বলা যায় না। জানার বিষয় হল, তার এ কথাটি কি ঠিক?
উত্তর : হ্যাঁ, তার কথা ঠিক। তাকবীর তাশরীক ফরয নামাযের পর সাথে সাথেই বলা নিয়ম। নামায শেষে কথাবার্তা বলে ফেললে কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে তাকবীরে তাশরীক বলার সময় থাকে না। তাই এক্ষেত্রে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে। —বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৬০; আলমুহীতুল বুরহানী ২/৫১০; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৬; ফাতহুল কাদীর ২/৫০; আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৫

আবদুল্লাহ
সিলেট

৪৩৩২ প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ফজরের নামায অবস্থায় সূর্যোদয় হয়েছে কি না তা দেখার জন্য নিজের হাত ঘড়ির দিকে দেখে এবং কয়টা বাজে তাও মোটামুটি বুঝে ফেলে। এখন জানার বিষয় হল, নামাযে এভাবে ঘড়ি দেখার কারণে নামায নষ্ট হয়েছে কি না?
উত্তর : নামায অবস্থায় ঘড়ি দেখার কারণে নামায মাকরূহ হয়েছে। নষ্ট হয়নি। ইচ্ছাকৃত এমনটি করা উচিত নয়। —আলমুহীতুল বুরহানী ২/১৫৯; ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা পৃ. ১২; মারাকিল ফালাহ পৃ. ১৮২; মাজমাউল আনহুর ১/১৮২

রুহুল আলম
সিলেট

৪৩৩৩ প্রশ্ন : বিতর নামাযে দুআয়ে কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়লে সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে কি না?
উত্তর : না, বিতর নামাযে দুআয়ে কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়লে সাহু সিজদা আসবে না। বরং ফিকহের কিতাবাদীতে দুআয়ে কুনূতের সাথে দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম বলা হয়েছে। —খিযানাতুল আকমাল ১/১৭৮; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৪; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৪৪; আদ্দুররুল মুখতার ২/৬

তোফায়েল আহমদ
সিলেট

৪৩৩৪ প্রশ্ন : গত রমযানে আমাদের পাশের মসজিদে ইমাম সাহেব আসরের নামাযে তিন রাকাত পড়ে ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেন। পিছন থেকে কিছু মুসল্লী বলে উঠে, নামায তিন রাকাত হয়েছে। তা শুনে ইমাম সাহেব সোজা দাঁড়িয়ে যান। অবশিষ্ট রাকাতটি পূর্ণ করে সাহু সিজদা করে সালাম ফিরিয়ে দেন। জানার বিষয় হল, ইমাম সাহেবের উক্ত নামাযটি সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব এবং তার অনুসরণকারী মুসল্লীদের নামায সহীহভাবে আদায় হয়েছে। তবে যেসব মুসল্লী ইমাম ভুলে সালাম ফিরানোর পর কথা বলে ফেলেছেন তাদের নামায নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নামাযটি পুনরায় আদায় করে নিবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনাঃ ৪৪৮৭ ; কিতাবুল আছল ১/২১১; আলমাবসূত, সারাখসী ১/২১১; ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়্যা ১/১০০; খিযানাতুল আকমাল ১/৪৭; ফাতাওয়া কাযীখান ১/৭৯

মামুন
নোয়াখালী

৪৩৩৫ প্রশ্ন : মাসবুক হওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো ভুলে যাই- ইমামের সাথে কত রাকাত পেলাম। তখন আমার সাথেই নামাযে দাখেল হয়েছে এমন কোনো মাসবুকের প্রতি লক্ষ্য করে অবশিষ্ট নামায পড়ার দ্বারা নামায সহীহ হবে কি?

উত্তর : মাসবুক তার পাশের লোকের প্রতি খেয়াল করে ছুটে যাওয়া রাকাতের কথা স্মরণ করে নামায পড়লে তার নামায হয়ে যাবে। তবে নামাযে ভালোভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত। যেন এমন ভুল না হয়। -শরহুল মুনয়া, পৃ. ৪৬৭; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১০৪; আলবাহরুর রায়েক ১/৩৭৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৯২; আদ্দুররুল মুখতার ১/৫৯৭

আবদুর রহমান
নোয়াখালী

৪৩৩৬ প্রশ্ন : আমরা দেখি যে, বিশিষ্টজনদের জানাযার নামায কিংবা ঐতিহাসিক কোনো ঈদগাহে ঈদের নামাযের দৃশ্য কাভারেজ করতে ফটোসাংবাদিকদের ফটোসেশনের হিড়িক পড়ে। এতে অজ্ঞতাবশত কিংবা অবচেতনে কোনো কোনো মুসল্লি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এখন প্রশ্ন হল তাদের নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : নামাযরত অবস্থায় এভাবে কোনো জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকা মাকরূহ। এটি নামাযের খুশু-খুযু পরিপন্থী। আর ঘাড় বাঁকিয়ে এদিক ওদিক তাকালে তো নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে।

উল্লেখ্য, ছবি উঠানো ও ভিডিও করার প্রচলিত এ রেওয়াজ অত্যন্ত গর্হিত ও বর্জনীয়। এতে অন্যান্য ক্ষতির পাশাপাশি মানুষের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে থাকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১; জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৮৭; উমদাতুল কারী ৫/৩১০; আলবাহরুর রায়েক ২/২১; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/১৬৩; মাআরিফুস সুনান ৫/১১৭

আবদুস সামাদ
জকিগঞ্জ, সিলেট

৪৩৩৭ প্রশ্ন : আমি একদিন ভুলে নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা না দিয়ে নামায শেষ করে ফেলি। এমতাবস্থায় আমার নামায কি সহীহ হয়েছে? এবং ঐ সিজদা পরে কিভাবে আদায় করব?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত নামায সহীহ হয়েছে। তবে সিজদায়ে তিলাওয়াত না করার কারণে অনুত্তম হয়েছে। আর ঐ সিজদা যেহেতু নামাযে আদায় করা হয়নি তাই তা আর আদায় করতে হবে না। কেননা নামাযের সিজদায়ে তিলাওয়াত নামাযের বাইরে আদায় করার বিধান নেই।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ যদি নামাযে ভুলে সিজদায়ে তিলাওয়াত না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, অতঃপর নামায পরিপন্থী কোনো কাজ করার আগে তা স্মরণ হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ তা আদায় করে সাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করবে। -কিতাবুল আছল ১/২৭৬; আলমুহীতুল বুরহানী ২/৩৩৩; বাদায়েউস সানায়ে ১/৪১০; আলবাহরুর রায়েক ২/১২৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৬১

মাহবুব হোসেন
কানাডা

৪৩৩৮ প্রশ্ন : একদিন আমি একাকী নামায পড়ছি, আর আমার পাশে এক ব্যক্তি বসা ছিলেন, তো আমি ঠোঁট নাড়িয়ে আস্তে আস্তে কেরাত পড়ছি। নামায শেষে ঐ ব্যক্তি আমাকে বললেন, নামাযে আস্তে আস্তে পড়ার সর্বনিম্ন স্তর হল নিজের কানে শোনা, শুধু ঠোঁট নাড়ালে হবে না। এখন জানার বিষয় হল ঐ ব্যক্তির কথা কি ঠিক?

উত্তর : নামাযে নিম্নস্বরে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে এমনভাবে পড়তে হবে, যেন হরফগুলো ভালোভাবে উচ্চারিত হয়। এতেই নামায সহীহ হয়ে যাবে। কানে শোনা আবশ্যক নয়। -কিতাবুল আছল ১/৬; বাদায়েউস সানায়ে ১/৩৯৭; আলবাহরুর রায়েক ১/৩৩৬; ইলাউস সুনান ৪/১৩

মূসা আহমদ
সিলেট

৪৩৩৯ প্রশ্ন : মুহতারাম মুফতী সাহেব, আমার অনেকগুলো সিজদায়ে তিলাওয়াত একত্রিত হয়ে গেছে, যা আদায় করিনি। এখন এগুলো আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কী? প্রত্যেক সিজদার জন্য আলাদা দাঁড়ানো লাগবে কি না?- জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া। এভাবে প্রত্যেক সিজদার জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব। তবে না দাঁড়িয়ে বসা থেকে সিজদায় গেলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, আয়াতে সিজদা পড়ার পর সম্ভব হলে তখনি সিজদা করা উচিত। বিনা কারণে তা আদায়ে বিলম্ব না করাই ভালো। -তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৫০৫; ফাতহুল কাদীর ১/৪৭৭; আলবাহরুর রায়েক ২/১২৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৫; রদ্দুল মুহতার ২/১০৭

জানাযা-দাফন

সায়েম জাওয়াদ
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

৪৩৪০ প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে, লাশ দাফন শেষে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়। আমার জানার বিষয় হল, এ কাজটি কি শরীয়তসম্মত? এ সংক্রান্ত সঠিক মাসআলাটি জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর : কবরের মাটি ভালোভাবে জমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া জায়েয। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। তিনি নিজ সন্তান ইবরাহীমের কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। (মারাসিলে আবূ দাউদ, হাদীস ৩৮৭) তবে এটাকে প্রথায় পরিণত করা বা জরুরি মনে করা যাবে না। -কিতাবুল আছার, ইমাম মুহাম্মাদ, বর্ণনা : ২৫৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৯৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/৬৫; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৪/৮০; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৬২৭

আবদুল কাইয়ূম
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

৪৩৪১ প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একদিন জানাযার নামাযে ইমাম সাহেব ভুলবশত পঞ্চম তাকবীর দিয়ে ফেলেন। নামাযের পর মানুষ হৈচৈ শুরু করে দিলে উপস্থিত একজন আলেম বলেন, নামায হয়ে গেছে। আমার জানার বিষয় হল, ঐ নামাযটি কি আদায় হয়েছিল? আর এ ধরনের ক্ষেত্রে মুক্তাদির করণীয় কী হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, আপনাদের উক্ত জানাযার নামায আদায় হয়েছে। জানাযার চার তাকবীরের অতিরিক্ত বলা ভুল। তবে এ ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় না। তাই ইমাম পঞ্চম তাকবীর দিলে মুক্তাদি ইমামের অনুসরণ করবে না। বরং অপেক্ষায় থাকবে এরপর ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। –ফাতহুল কাদীর ২/৮৭; ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়্যা ১/১৫৫; আলমাবসূত, সারাখসী ২/৬৪; আলবাহরুর রায়েক ২/১৮৪; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২

ওয়ালী উল্লাহ
কুইন্স, নিউইয়র্ক

৪৩৪২ প্রশ্ন : রমযান মাসে জুমার নামাযের পর আমাদের মসজিদে একটি জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হল। তো জানাযার নামাযে ইমাম সাহেব তিন তাকবির বলে ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেন। পরে মুসল্লীগণ তাঁকে তা জানালে তিনি বললেন, ভাই! নামায তো হয়ে যাবে, তারপরও আমরা নামায আবার পড়ে নিই। জানার বিষয় হল, এভাবে জানাযার নামাযে এক তাকবীর ছুটে গেলে নামায কি হয়ে যাবে?

উত্তর : বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, জানাযার তাকবীর চারটি। ফকীহগণ বলেন, এই চার তাকবীরই জানাযার রুকন ও ফরয। একটি তাকবীর ছুটে গেলেও জানাযা সহীহ হবে না। অবশ্য ভুলবশত তিন তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে নামায পরিপন্থী কোন কাজ করার আগেই যদি চতুর্থ তাকবীর দিয়ে দেয় অতপর আবার সালাম ফেরায় তাহলে জানাযা সহীহ হয়ে যাবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৫২; আলবাহরুর রায়েক ২/১৮০; বাদায়েউস সানায়ে ২/৫২; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৭৮; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২

যাকাত-সদাকা

মামুন বিন শাফায়েত
চাটখিল, নোয়াখালী

৪৩৪৩ প্রশ্ন : আমার বেশ কিছু টাকার উপর এ বছর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। ব্যবসার সম্পদও আছে প্রায় ৬ লাখ টাকার। তাই চিন্তা করেছি এলাকার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাপড়ের মাধ্যমে আদায় করব। করা যাবে কি এটা?

উত্তর : নগদ টাকার মাধ্যমেই যাকাত আদায় করা উত্তম। যেন যাকাতগ্রহীতা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যয় করতে পারে। গ্রহীতার প্রয়োজন বিবেচনা না করে ঢালাওভাবে শাড়ি-কাপড় ইত্যাদি দ্বারা যাকাত আদায়ের প্রচলনটি ঠিক নয়। এতে কখনও এমন হয় যে, এক গরীব একাধিক কাপড় পায় অথচ তার চাল-ডাল বা অন্য কিছুর প্রয়োজন। ফলে সে তার কাপড়টি অল্পমূল্যে বিক্রি করে। এতে করে প্রকৃত অর্থে গরীব পুরো টাকাটা পায় না। অবশ্য কেউ যদি যাকাতের টাকা দ্বারা কাপড় কিনে তা গরীবদেরকে দিয়ে দেয় তবে তাতেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কাপড় বা যে জিনিসই দেওয়া হোক এক্ষেত্রে গ্রহীতার কী ধরনের জিনিস প্রয়োজন সে বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ১০৫৩৯; কিতাবুল আছল ২/১০৪; বাদায়েউস সানায়ে ২/১৪৬; আলবাহরুর রায়েক ২/২২১; ফাতহুল কাদীর ২/১৪৫

মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান
মিরপুর, ঢাকা

৪৩৪৪ প্রশ্ন : আমার মরহুম পিতার ক্রয়কৃত কিছু শেয়ার আমার তত্ত্বাবধানে আছে। আমি যাকাত হিসাব করার সময় ঐ শেয়ারগুলোর তাৎক্ষণিক বাজারমূল্য ধরে যাকাত দেই। বর্ণিত পদ্ধতিতে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কি না? উল্লেখ্য, শেয়ারগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা হয় না ; বরং কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক ডিভিডেন্ড গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বর্ণিত শেয়ারগুলো এজমালী অবস্থায় আছে। এজমালী অবস্থায় শেয়ারগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ২,৯০,৬৮০ টাকা। কিন্তু প্রত্যেক অংশীদারকে যদি অংশ দেওয়া হয় তাহলে–

প্রত্যেক ভাই পাবে– ৫০৮৬৯.০০
প্রত্যেক বোন পাবে– ২৫৪৩৪.৫০
মাতা পাবে– ৩৬৩৩৫.০০

উল্লেখ্য, আমরা ৪ ভাই, ২ বোন এবং মাতা জীবিত আছেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনারা যেভাবে যাকাত দিচ্ছেন তা দ্বারা আপনাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে আপনারা যেহেতু ক্যাপিটাল গেইন তথা শেয়ারের ব্যবসা করেন না; বরং কোম্পানী থেকে ডিভিডেন্ড গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তা আপনারা রেখেছেন। তাই যাকাতের হিসাবের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে শেয়ারগুলোর বাজারমূল্য বিবেচনায় নিতে হবে না; বরং আপনারা যাকাত দিবেন কোম্পানীর ব্যালেন্সশীট দেখে। এক্ষেত্রে ফিক্সড্ এসেটস (Fixed Assets) অর্থাৎ বিল্ডিং, মেশিনারিজ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি, যা যাকাতযোগ্য নয় সেগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ (যেমন, কাঁচামাল, বিক্রিয়যোগ্য পণ্য, নগদ টাকা ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এবং সে টাকা ও সম্পদ থেকে আপনাদের শেয়ারের আনুপাতিক হারে যত হয় তার ২.৫% আপনারা যাকাত দিবেন।

উল্লেখ্য, এজমালী সম্পদের উপর সমষ্টিগতভাবে যাকাত ফরয হয় না; বরং মীরাছনীতি অনুযায়ী যে যতটুকু অংশ পাবে ততটুকুর যাকাত (যদি সে নেসাবের মালিক হয়) তাকে আদায় করতে হয়। তবে ওয়ারিশগণের সম্মতি থাকলে যৌথভাবেও যাকাত আদায় করা যাবে। –মাআরিফুস সুনান ৫/১৮৮; মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা ৪, ১/৮৮১; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/২০১; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/২১

হজ্ব-উমরা

আবদুর রহীম
রাজশাহী

৪৩৪৫ প্রশ্ন : একদিন এহরাম অবস্থায় রাত্রে ঘুমানোর সময় ঠাণ্ডার কারণে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। প্রথমদিকে মুখ খোলা রেখেই ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু ঘুমে আমার অজান্তেই মাথা ঢেকে ফেলি। দেশে আসার পর এ বিষয়ে এক হাজ্বী সাহেবের সাথে কথা বললে তিনি বললেন, আপনাকে দম দিতে হবে। অবশ্য আমি রাত ১১ টায় ঘুমিয়েছি তিনটায় উঠে পড়েছি। এখন আমি এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার উপর দম ওয়াজিব হয়নি। কারণ ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় মুখ ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব হয়। এর কম হলে দম ওয়াজিব হয় না। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে এক সদকায়ে ফিতর পরিমাণ খেজুর বা তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। –আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১২৮; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪৩০; গুনয়াতুন নাসিক পৃ. ২৫৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৮০; মানিসক, মোল্লা আলী আলকারী পৃ. ৩০৭

হায়বাতুল্লাহ
মোমেনশাহী

৪৩৪৬ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার পুরাতন অভ্যাসের কারণে এহরাম অবস্থায়ও নাকের দুই-তিনটি পশম উপড়ে ফেলেছে। জানতে চাচ্ছি, এহরাম অবস্থায় তার এ কাজটি জায়েয হয়েছে কি? নাজায়েয হলে তার জরিমানা কী হবে?

উত্তর : এহরাম অবস্থায় শরীরের যে কোনো পশম কাটা বা উপড়ানো নাজায়েয। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি দুই-তিনটি পশম উঠানো অন্যায় হয়েছে। এ কারণে সামান্য কিছু যেমন কয়েকটি রিয়াল সদকা করে দিলেই হবে। –ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৮৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৯; মানাসিক, মোল্লা আলী আলকারী পৃ. ৩২৮; গুনয়াতুন নাসিক পৃ. ২৫৬

নিকাহ-তালাক

মাহমুদুল হাসান
ওয়েব থেকে

৪৩৪৭ প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম। পিতা-মাতার চাচা ও মামা কি মেয়ের জন্য মাহরাম না গায়রে মাহরাম?
এমনিভাবে পিতা-মাতার খালা ও ফুফু কি ছেলের জন্য মাহরাম না গায়রে মাহরাম?

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম। পিতা-মাতার চাচা ও মামা মাহরাম। এমনিভাবে পিতা-মাতার খালা ও ফুফুও মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। –কিতাবুল আছল ৪/৩৫৮; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩৬০; বাদায়েউস সানায়ে ২/৫৩০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৩

ফারুক আসলাম
বরুরা, কুমিল্লা

৪৩৪৮ প্রশ্ন : মুহতারাম, হানিফ ছোটবেলায় যে মহিলার দুধ পান করেছিল তার স্বামীর ছোট বোন অর্থাৎ সে মহিলার ননদ ফারজানার সাথে হানিফের বিবাহের আলোচনা চলছে। গ্রামের এক মুরুব্বী বললেন, এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ এ মেয়ে তো হানিফের মাহরাম। আবার অন্য এক মুরুব্বী বললেন, এত দূরের সম্পর্কে বিবাহ হতে কোনো সমস্যা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিবাহের হুকুম কী? দুধ মা'র ননদের সাথে বিবাহ কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর : ফারজানার সাথে হানিফের বিবাহ বৈধ হবে না। কারণ, ফারজানা হানিফের দুধ সম্পর্কীয় ফুফু। আর আপন ফুফুর মত দুধ ফুফুর সাথেও বিবাহ হারাম। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

অর্থাৎ জন্মসূত্রের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৪৪) –শরহে মুসলিম, ইমাম নববী ১০/১৯; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/৩৬৩; আলমুহীতুল বুরহানী ৪/৯৩; আলবাহরুর রায়েক ৩/২২৬

মান্নত-কসম

উম্মে আবদুল্লাহ
আকুয়া, মোমেনশাহী

৪৩৪৯ প্রশ্ন : কয়েকদিন আগে আমার সন্তান খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন আমি মান্নত করেছিলাম, যদি আমার সন্তান সুস্থ হয় তবে আমি ফকীরদেরকে খানা খাওয়াবো। এখন আল্লাহর রহমতে আমার সন্তান সুস্থ হয়েছে। আমি জানতে চাচ্ছি যে, আমাকে কয়জন ফকীরকে খানা খাওয়াতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার মান্নত আদায়ের জন্য অন্তত দশজন ফকীর মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়াতে হবে। –বাদায়েউস সানায়ে ৪/২৪৫; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১২৯; আলমুহীতুল বুরহানী ৬/৩৫৩; আলবাহরুর রায়েক ৪/২৯৬

টিপু সুলতান
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪৩৫০ প্রশ্ন : মুহতারাম, আমার এক কলিগ তার স্ত্রীর সাথে অনেকদিন আগে একবার এভাবে কসম করেছিল যে, 'যাও! মক্কা মদীনার কসম করে বলছি, আমি আর কখনো ইচ্ছা করে নামায ছাড়ব না। সর্বদা নামায পড়ব।' কিন্তু সে এর পরও অনেকবার নামায ছেড়ে দিয়েছে।
এখন তার করণীয় কী? তাকে কি এর কাফফরা আদায় করতে হবে? কীভাবে আদায় করবে? বিষয়গুলো জানানোর অনুরোধ রইলো।

উত্তর : প্রশ্নের ঐ কথা দ্বারা কসম সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম করা জায়েয নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

'যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম করল সে (যেন) আল্লাহর সাথে শিরক করল' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩২৫১) সুতরাং প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির এভাবে কসম করা জায়েয হয়নি। এজন্য তাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আর তার উক্ত কথার দ্বারা যেহেতু কসম সংঘটিত হয়নি তাই এর কারণে তাকে কোনো কাফফারাও আদায় করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে মারাত্মক কবীরা গুনাহ হয়েছে। এজন্য তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে এবং উক্ত নামাযগুলোর কাযা পড়ে নিতে হবে।
প্রকাশ থাকে যে, নামায ইসলামের অন্যতম রুকন। ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেওয়াকে হাদীসে কুফুরী গুনাহ বলা হয়েছে। অতএব, প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য নামাযের ব্যাপারে পরিপূর্ণ যত্নবান হওয়া। –বাদায়েউস সানায়ে ৩/১৬; ফাতহুল কাদীর ৪/৩৫৬; রদ্দুল মুহতার ৩/৭১২

ওয়াক্‌ফ

এনামুল হাসান
উত্তরখান, ঢাকা

৪৩৫১ প্রশ্ন : হুযূর, আমি একটি মসজিদের ক্যাশিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। মসজিদ ফান্ডের লাখ লাখ টাকা আমার কাছে থাকে। আমিই এ টাকাগুলো মসজিদের নামেই ব্যাংকের একটি কারেন্ট একাউন্টে জমা করি এবং প্রয়োজনের সময় উত্তোলন করে খরচ করি। গত কয়েকদিন আগে আমার একটি ব্যক্তিগত কাজে লাখ দেড়েক টাকার প্রয়োজন হয়। তখন আমি শীঘ্রই ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়তে দেড় লাখ টাকা মসজিদের একাউন্ট থেকে উত্তোলন করে খরচ করে ফেলি। জানতে চাচ্ছি, আমার এ কাজটি কি ঠিক হয়েছে? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : না, পরবর্তীতে ফেরত দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও মসজিদের টাকা নিজ প্রয়োজনে খরচ করা অন্যায় ও খেয়ানত হয়েছে। কেননা মসজিদের টাকা আপনার নিকট আমানত। আর আমানতের টাকা থেকে নিজ প্রয়োজনে খরচ করা বা ঋণ নেওয়া জায়েয নয়।
সুতরাং এখন আপনার কর্তব্য হল, যত দ্রুত সম্ভব ঐ টাকা মসজিদ ফান্ডে ফেরত দেওয়া এবং এর জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা-এস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে এমনটি করা থেকে বিরত থাকা। –ফাতাওয়া খানিয়া ৩/২৯৯; আলবাহরুর রায়েক ৫/২৫১; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৪/৮২

মনির হোসেন
কুমিল্লা

৪৩৫২ প্রশ্ন : আমাদের ঈদগাহ ঈদের নামাযের পূর্বে ধোয়ামোছা করে নামাযের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বাকি পুরো বছর সেখানে মানুষের চলাফেরা, খেলাধুলা, এমনকি কখনো গবাদি পশু বিচরণ করতেও দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হল, দাতা কর্তৃক ঈদের নামাযের জন্য ওয়াকফ করার পরও সেখানে বর্ণিত কাজগুলো করার অবকাশ আছে কি না?

উত্তর : ঈদগাহ সম্মানিত ও পবিত্র স্থান। ঈদগাহের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গা খেলাধুলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঈদগাহের উপর দিয়ে চলাচল করা জায়েয আছে। আর ঈদগাহ যেহেতু পবিত্র স্থান তাই এর ভেতর কোনো গবাদি পশু চরতে দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, ঈদগাহের পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসীর উচিত তা সীমানাদেয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে ঘেরাও করে হেফাযত করা। –আলবাহরুর রায়েক ২/৩৬; শরহুল মুনয়া পৃ. ৬১৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৭; রদ্দুল মুহতার ১/৬৫৭

আবদুল্লাহ
নোয়াখালী

৪৩৫৩ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের দেয়ালে 'মসজিদে দুনিয়াবী কথা হারাম' বাক্যটি টাইলসে খোদাই করে লাগানো। এখন প্রশ্ন হল, নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার পর কখনো দুনিয়াবী কথাবার্তাও হয়ে যায়। তখনো কি হারাম হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত কথাটি ব্যাপকভাবে বলা ঠিক নয়। নামায বা ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশের পর অন্যের ইবাদতে অসুবিধা না হলে প্রয়োজনে দুনিয়াবী বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, মসজিদ আল্লাহর ঘর। এটি ইবাদতের স্থান। এর প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে। সুতরাং মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়াবী কোন কাজকর্ম বা কথাবার্তাকে উদ্দেশ্য করে মসজিদে গমন করা কিংবা মসজিদে এর আয়োজন করা নাজায়েয। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৭; উমদাতুল কারী ৪/২২৯; আলবাহরুর রায়েক ২/৩৬; রদ্দুল মুহতার ১/৬৬২

মুআমালা-লেনদেন

মুহাম্মাদ জুবায়ের
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

৪৩৫৪ প্রশ্ন : আমার চাচাতো ভাইয়ের একটি কাপড়ের দোকান আছে। বছর খানেক আগে সেখানে বিনিয়োগের জন্য তাকে দুই লাখ টাকা দিয়েছিলাম। সে বলেছিল, প্রতি মাসে দুই-আড়াই হাজার টাকা করে দিবে। আর বছর শেষে যখন হিসাব হবে তখন চূড়ান্ত হিসাব করে লভ্যাংশ উভয়ে বণ্টন করে নেব। তবে কোনো অংশ উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে এভাবে চুক্তি করা বৈধ হল কি না। আর আমি যে লাভ গ্রহণ করছি তা গ্রহণ করা জায়েয হচ্ছে কি না? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে লভ্যাংশের হার নির্ধারণ করা জরুরি ছিল। এখন আপনাদের কর্তব্য, বিগত দিনের জন্য আপনার বিনিয়োগকৃত টাকার লভ্যাংশ অর্ধার্ধি (অর্থাৎ ৫০% হারে) ভাগ করে নেয়া। আর সামনের জন্য লভ্যাংশের হার আলোচনা করে ঠিক করে নেবেন। সেটা ৫০% করেও হতে পারে অথবা কম-বেশিও হতে পারে। আর বিনিয়োগকারীকে প্রতি মাসে লভ্যাংশ থেকে কিছু কিছু করে দেওয়া অতপর মেয়াদ শেষে হিসাব করে তা সমন্বয় করে নেওয়া জায়েয আছে। এতে অসুবিধা নেই। –বাদায়েউস সনায়ে ৫/১১১; আলমুহীতুল বুরহানী ১৮/১৪০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ১৪১১; শরহুল মাজাল্লাহ ৪/৩৩২

ফাহীম সিদ্দীক
বাড্ডা, ঢাকা

৪৩৫৫ প্রশ্ন : আমাদের বাড়িতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য একটি জেনারেটর ভাড়ায় আনা হয়। কথা ছিল, দুপুর থেকে শুরু করে রাত ১২টা পর্যন্ত জেনারেটর চলবে। কিন্তু সন্ধ্যার একটু পরে জেনারেটরটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমরা তাড়াহুড়া করে বেশি ভাড়া দিয়ে অন্য একটি জেনারেটর ভাড়া নেই। এখন পূর্বের জেনারেটরের মালিক বলছে, তাকে পূর্ণ ভাড়ার চেয়ে সামান্য কম দিতে। জানতে চাই, শরীয়তের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে তার ভাড়ার হিসাব কীভাবে করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে পূর্বের জেনারেটরটি যতটুকু সময় ব্যবহার উপযোগী ছিল ততটুকু সময়েরই ভাড়া তার প্রাপ্য। এর অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করা তার জন্য বৈধ হবে না। –আলমুহীতুল বুরহানী ১১/২২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪১৩; শরহুল মাজাল্লাহ ২/৫৫৪

ইসমাঈল হক
লালমনিরহাট

৪৩৫৬ প্রশ্ন : বাজারে আমার মুদী ও কাপড়ের ব্যবসা আছে। আমার এক আত্মীয় গত এক মাস আগে বিদেশ যাওয়ার সময় আমাকে দুই লাখ টাকা দেয়– আমার ব্যবসাতে লাভ-লস সমান অংশীদারীর ভিত্তিতে খাটানোর জন্য। কিন্তু আমার উক্ত ব্যবসাদুটির বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে আরো পুঁজি বিনিয়োগ করা উচিত হবে বলে মনে হয় না। তাই আমি চাচ্ছিলাম আমার ঐ আত্মীয়কে না জানিয়ে তার টাকা দিয়ে জমি ভাড়া নিয়ে চাষাবাদ করার জন্য। অতপর ফসল মাড়াই করে বিক্রি করে লাভ-লস বণ্টন করার জন্য। আর সে তো লাভের জন্যই দিয়েছে। জানতে চাচ্ছি, এভাবে টাকা খাটানোতে কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর : না, মালিককে না জানিয়ে ঐ টাকা ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা জায়েয হবে না। কারণ প্রশ্নের বর্ণনামতে তিনি টাকা দিয়েছেন আপনার বর্তমান মুদী ও কাপড়ের ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য। জমি ভাড়া নিয়ে চাষাবাদ করার জন্য নয়। তবে লোকটি অনুমতি দিলে তার টাকা দিয়ে জমি ভাড়া নিয়ে উক্ত ব্যবসা করতে পারবেন। অতপর যা লাভ হবে তা উভয়ের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে। –শরহুল মাজাল্লাহ, খালিদ আতাসী ৪/৩৪৩; কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার ৮/২৮৯

আলী মুরতাযা
তালুক দুলালী, লালমনিরহাট

৪৩৫৭ প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয়ের একটি রাইসমিল আছে। তাতে নতুন কিছু মেশিনারিজ কেনার জন্য ১,৩০,০০০/- টাকার প্রয়োজন। সে আমার সাথে এভাবে চুক্তি করতে চাচ্ছে যে, আমি তাকে ঐ টাকা দিলে সে প্রতি মাসে আমাকে ১৭০০/- টাকা লাভ দিবে। এর পর বাকি লাভ যা থাকবে ছয়মাস পর পর হিসাব করে বণ্টন হবে। তখন লাভের পরিমাণ দেখে ইনসাফের ভিত্তিতে শতকরা হারে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে বাকি লাভ নেওয়া হবে।

একজন বললেন, এভাবে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট আকারে লাভ নেওয়া হলে বাকি বিনিয়োগটি জায়েয হবে না। কিন্তু আমার

আত্মীয়ের কথা হল প্রতি মাসে একটি অংক নিলেও ৬ মাস পর বাকি লাভ যেহেতু শতকরা হারে বণ্টিত হচ্ছে তাই কোনো সমস্যা নেই।

মুফতী সাহেবের নিকট জানতে চাচ্ছি, উপরে বর্ণিত নিয়মে কি আমি বিনিয়োগটি করতে পারব?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী মাসে ১৭০০ টাকা নির্দিষ্ট করে নিবে এ শর্ত করলে উক্ত চুক্তি নাজায়েয হয়ে যাবে। পরবর্তীতে বাকি লাভ শতকরা হারে বণ্টিত হলেও তা জায়েয হবে না। কারণ লাভের একটা অংক কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট করা হলেই সেই লেনদেন নাজায়েয হয়ে যায়।

অতএব বিনিয়োগটি সহীহভাবে করতে চাইলে কারো জন্য কোনো অংক নির্ধারণ না করে শুরু থেকেই চুক্তির সময়ই লভ্যাংশের হার নির্ধারণ করে নিতে হবে। যেমন বিনিয়োগকারী ৬০% মিলমালিকের ৪০%। অথবা এ ধরনের অন্য কোনো পরিমাণ।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত সহীহ পন্থায় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যবসার চূড়ান্ত হিসাব হওয়ার পূর্বে অন্তর্বর্তিকালীন কিছু টাকা অগ্রিম লভ্যাংশ হিসেবে বিনিয়োগকারীকে দেয়া যাবে। যা চূড়ান্ত হিসাবের পর সমন্বয় করে নিতে হবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ১৮/১২৬; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ১৪১১; আলমাবসূত, সারাখসী ২২/২৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/২৮৭; আলমাআয়ীরুশ শারইয়্যাহ পৃ. ২৪০

বিবিধ

মুহাম্মাদ হাসান
উত্তরখান, ঢাকা

৪৩৫৮. প্রশ্ন : হুযূর! আমি ও আমার ছেলেমেয়েরা পাখি পছন্দ করি। তাই লালন পালন করে পোষ মানানোর জন্য ও কথা শেখানোর জন্য একটি পাখি ক্রয় করেছি। এটাকে আমি খাঁচায় বন্দি করে রাখি এবং নিয়মিত খাবার দেই। একজন এটা দেখে বললেন, কোনো প্রাণীকে এভাবে খাচায় বন্দি করে রাখা উচিত নয়। এতে প্রাণীর কষ্ট হয়। তাই জানতে চাচ্ছি, এভাবে খাচাবন্দি করে পাখি লালন-পালন করার বিধান কী? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেসব পাখি খাচাতেই জন্মায় এবং এখানেই বড় হয় অর্থাৎ (উড়া পাখি নিয়ে এসে বন্দি করা হয়েছে এমন নয়) এসব পালিত পাখিকে নিয়মিত খাবার পানি ও চিকিৎসা দিয়ে সুন্দরভাবে পরিচর্যা করতে পারলে খাচায় রেখে লালন-পালন করা জায়েয হবে। কিছু সাহাবী থেকে খাচায় পাখি লালন-পালন করা প্রমাণিত রয়েছে। হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُونَ الطَّيْرَ فِي الْأَقْفَاصِ.

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. মক্কায় ছিলেন। তখন সাহাবীগণ খাচায় পাখি রাখতেন। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৩৮৩)

কিন্তু এক্ষেত্রে যথাযথ পরিচর্যা করতে হবে। পরিচর্যা করতে না পারলে অথবা বন্দি করে রাখার কারণে কষ্ট পেলে খাচায় আটকে রাখা জায়েয হবে না। বরং ছেড়ে দিতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, বাইরে উড়ে বেড়ায় এমন পাখিকে খাঁচায় বন্দী করলে তাদের কষ্ট হতে পারে। তাই এ ধরনের পাখি খাঁচায় বন্দী না করাই উচিত। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬২০৩; ফাতহুল বারী ১০/৬০১; ফাতাওয়া কারিইল হেদায়া পৃ. ২০০; রদ্দুল মুহতার ৬/৪০১

রায়হান মাহমুদ
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪৩৫৯. প্রশ্ন : আমরা ৭ জন ছাত্র একটি ফ্ল্যাটে দুইটি রুম নিয়ে থাকি। এক রুমে তিনজন মুসলমান। অন্যরুমে ৪ জন হিন্দু ছাত্র থাকে। মেসে সবাইকে বাজার করতে হয়।

জানতে চাই, এক্ষেত্রে তাদের সাথে আমাদের চলাফেরা ও খাওয়ার কী হুকুম হবে? তা জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মুসলামানদের কর্তব্য হল, সৎ ও নেককার মুসলমানদের সাথেই চলাফেরা করা। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে পড়াশুনা, চাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাথে একত্রে অবস্থানের প্রয়োজন হলে তাদের সাথে প্রতিবেশী সুলভ সাধারণ সৌজন্য সম্পর্ক রাখবে। এবং একত্রে অবস্থানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবে :

ক. তাদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করা যাবে না।

খ. সবসময় নিজের ঈমান ও ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার প্রতি পূর্ণ যত্নবান থাকবে।

গ. তাদের ধর্মীয় কোনো উৎসবে কিংবা তাদের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না।

ঘ. জীবনাচারের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বেশভূষা ও কৃষ্টিকালচারের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর তাদের কেনা হালাল খাবার খেতে অসুবিধা নেই। তবে তাদের জবাইকৃত কোনো প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। এমনিভাবে তাদের প্রস্তুতকৃত কোনো খাবারে নাপাকির আশঙ্কা থাকলে তা খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে। -সূরা মায়েদা (৫): ৫৭; সূরা আলে ইমরান (৩) : ১১৮; আলজামে লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী ৪/১২২; শরহুস সিয়ারিল কাবীর ১/১০৩; ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা পৃ. ৭৩; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৬; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৬৮ ●

শিক্ষার্থীদের পাতা

আমার মুহসিন কিতাব-৫

মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী রাহ.

[কয়েক সংখ্যা ধরে শিক্ষার্থীর পাতায় বড়দের মুহসিন কিতাব বিষয়ে লেখা ছাপা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত (রবিউস সানি ১৪৩৯ হি.) সংখ্যায় ছাপা হয়েছে হযরত মাওলানা ই'যায আলী রাহ.-এর লেখা। কিন্তু ভুলবশত সেখানে নাম এসেছে সায়্যিদ তালহা হাসানী রাহ.-এর। মুহতারাম পাঠকবৃন্দের কাছে নিজ নিজ নুসখা সংশোধন করে নেয়ার অনুরোধ রইল। মূলত সায়্যিদ তালহা হাসানী রাহ.-এর লেখা ছাপা হয়েছে তার আগের (রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হি.) সংখ্যায়। এই সংখ্যায় ছাপছে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী রাহ.-এর লেখা।

একটি কথা, যা আমি আগেও বলেছি– মালুমাত হাসিল করার জন্য এইসব লেখা তো ঠিক আছে। কিন্তু আমল ও অনুসরণের জন্য কেবল কোথাও কারো কোনো লেখা পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। সেজন্য জরুরি হল, নিজ উস্তাযের মশওয়ারা নেওয়া। তাছাড়া সব মুহসিন কিতাব সবার জন্য মুহসিন সাব্যস্ত হয় না। এমনিভাবে কোনো কিতাব এক বয়সে মুহসিন সাব্যস্ত হবে না বলে এটা জরুরি নয় যে, সেটি কখনোই তার জন্য মুহসিন হবে না। অতএব এটি পুরোই মশওয়ারা-নির্ভর একটি বিষয়।

আরেকটি বিষয় হল, আমাদের তালিবুল ইলম ভাইদের ইযাফী বা বাড়তি মুতালাআ সবসময়ই নিজেদের মাদরাসার উসূল-নেযাম অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। উসূল-নেযামের খেলাফ করা কখনোই উচিত নয়। প্রিয় তালিবুল ইলম ভাইদেরকে বিষয়দুটির প্রতি খুব যত্নের সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

হযরত মাওলানা আকবরাবাদী রাহ.-এর এই লেখায় দেওয়ানে হাফিয থেকে 'ফাল' বের করার কথা এসেছে। এটি কেবল একটি ঘটনার বর্ণনা। অনুসরণযোগ্য কোনো বিষয় নয়। আসলে কোনো কিতাব থেকেই 'ফাল' বের করা ঠিক নয়। শরীয়তেও এটি গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয় নয়। كان يعجبه الفأل الحسن এই কথার সঙ্গে এসব 'ফাল'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এই লেখায় কবি হাফিয সীরাজী রাহ.-এর ব্যাপারে লেখা হয়েছে, 'একবার তো তিনি একেবারে পীর-মুর্শিদের মতো কাজ করেছেন।' এটি একটি মাজায বা রূপক ব্যবহার, যা বর্জনীয়। বাস্তব কথা শুধু এতটুকুই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা আকবরাবাদী ছাহেবকে দেওয়ানে হাফিযের ঐ কবিতাগুলো মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে রাহনুমায়ী করেছেন। যদি তিনি হাফিযকে স্বপ্নে দেখে থাকেন কিংবা গায়ব থেকে কোনো আওয়ায শুনে থাকেন তাহলে সেটিও আল্লাহ তাআলার রহমত ও কুদরতেই হয়েছে। তাতে কবি হাফিযের কোনো দখল নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে বোঝার তাওফীক দান করুন। সবধরনের ভুল ভাবনা ও ভুল বুঝ থেকে হেফাযত করুন– আমীন। –মুহাম্মাদ আবদুল মালেক]

[সংক্ষিপ্ত জীবনী

মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী রাহ.-এর পৈতৃক ভূমি মুরাদাবাদ জেলার 'বিছরায়ূ' অঞ্চলে। বাবা সরকারি চাকুরির সূত্রে আগ্রার আকবরাবাদে থাকতেন। ১৩২৬ হিজরী মোতাবেক ১৯০৮ ঈসাব্দে সেখানেই তাঁর জন্ম। সেজন্য তাঁকে আকবরাবাদী বলা হয়।

প্রাথমিক পড়াশোনা তিনি নিজ বাড়িতেই, গৃহশিক্ষকের কাছে সম্পন্ন করেন। এরপর ভর্তি হন দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখান থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। এরপর বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে জেনারেল শিক্ষায় এমএ পাশ করেন।

পড়াশোনা সমাপ্ত করে প্রথমে 'ডাভেল'-এ তিন বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে আরবীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে কলকাতা আলিয়ার অধ্যক্ষ হন। ১৯৫৯ সালে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির দ্বীনিয়াত শাখার প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৮ সালে তিনি তাঁর মামাত ভাই মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভী রাহ. ও মুফতী আতীকুর রহমান উসমানী রাহ.-এর সাথে দিল্লিতে 'নদওয়াতুল মুসান্নিফীনে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর তাঁরই তত্ত্বাবধানে সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বুরহান' প্রকাশিত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত মোট সাতচল্লিশ বছর তিনি এই পত্রিকার দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে ওহীয়ে ইলাহী, সিদ্দীকে আকবার, হযরত উসমান যিন্নুরাইন, ফাহমে কুরআন, গোলামানে ইসলাম, ইসলাম মেঁ গোলামী কি হাকীকত, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী আওর উনকে নাকেদ ইত্যাদি।

১৪০৫ হিজরীর ৩০ রমযান/১৯৮৫ ঈসাব্দের ২৪ মে করাচিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।

করাচির দারুল উলূম কোরেঙ্গী কবরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। –ফয়সাল আহমাদ ভাটকালী]

আমার উর্দূ ও ফার্সী শিক্ষা এবং প্রাথমিক আরবী ও ইংরেজি শিক্ষা হয়েছে আগ্রাতেই। আমাদের বাড়িতে। আমার আব্বা আগ্রার স্বনামধন্য সরকারি ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন খুবই দ্বীনদার, বুযুর্গ। তিনি তালীমের চেয়ে তারবিয়াতকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন।

শুরুতে তিনি আমাকে আরবী পড়ানোর উদ্দেশ্যে দেওবন্দ থেকে যথাযোগ্য সম্মানী নির্ধারণ করে একজন মাওলানা সাহেবকে এনেছিলেন। যিনি সারাক্ষণ আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখতেন। পড়ালেখা ছাড়াও তিনি বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী এবং ইসলামী ইতিহাসের মর্মস্পর্শী গল্পগুলো শোনাতেন। সন্ধ্যাবেলা একজন শিক্ষক আসতেন ইংরেজি-অংক শেখাতে। এই ধারা অব্যাহত ছিল তিন বছর। এরমধ্যে অনেক বিষয়ে অগ্রগতি হলেও বিশেষভাবে কোনো ইলমী বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়নি।

১৯২২ সালে আমার বয়স যখন পনের তখন বিভিন্নজনের উপর্যুপরি অনুরোধে আব্বাজান আমাকে দেওবন্দে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখানে দরসী কিতাবাদি তো পড়তামই, এর পাশাপাশি কীভাবে যেন আরবী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ হতে লাগল। ফলে অতিরিক্ত সময়ে মিসরের বিভিন্ন পত্রিকা, পুস্তিকা এবং আরবী সাহিত্যের নতুন পুরনো কিতাবাদি খুব বেশি পড়তাম। আব্বা আমার মাসিক হাত খরচের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ পাঠাতেন। সেজন্য

আমার এইসব বই-পুস্তক সংগ্রহ করতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। সে সময়ই মুবাররাদের 'কামেল', 'আগানী', 'নিহায়াতুল আরাব', 'সুবহুল আ'শা' ইত্যাদি কিতাবগুলো মুতালাআ করেছি।

জাহেযের 'আলবায়ান ওয়াত তাবয়ীন' কিতাবটি আমাকে এমনভাবে যাদুগ্রস্ত করেছে যে, তার একেকটি অনুচ্ছেদ বারবার পড়েছি। প্রতিবারই নতুন অনুভব অনুভূতি লাভ করেছি। 'দেওয়ানুল হামাসা'র প্রতিও আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল। তার অসংখ্য কবিতা আমার মুখস্থ-ঠোঁটস্থ ছিল।

দরসী কিতাবের মধ্যে মানতেক, ফালসাফা, ফিকহ, তাফসীর, হাইআত, তারীখ, মাআনী-বায়ান-আরূয ইত্যাদি সব শাস্ত্রের কিতাবাদিই পড়েছি। তবে সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহের কারণে মাআনী ও বায়ান শাস্ত্রে সময় ব্যয় হত অনেক বেশি, যা অন্য কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে হত না।

মানতেক ও ফালসাফার দরসে অনেক কষ্টে মনোযোগ ধরে রাখতাম। কিন্তু যখন ইমাম গাযালী রাহ.-এর 'মাকাসিদুল ফালাসিফা' এবং 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' মুতালাআ করলাম তখন ফালসাফাতেও মজা পেয়ে গেলাম। এমনকি একসময় এই শাস্ত্রের প্রতি এত আগ্রহ হল যে, ইবনে সীনার 'ইশারাত' কিতাবটি ইমাম রাযী রাহ. ও নাসীরুদ্দীন তূসীর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর সহায়তা নিয়ে বুঝতে শুরু করলাম। এভাবে কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই পড়লাম।

আরবী কবিতায় দরসী কিতাবাদির বাইরে আবুল আলা মাআররীর 'সাকতুয যানদ' এবং 'লুযূমু মা লা ইয়ালযাম' এবং 'দেওয়ানে হাসসান বিন সাবিত'-এর খুব আশেক ছিলাম। অধিকাংশ সময় কিতাবগুলো আমার সঙ্গে থাকত। কিন্তু আমার এই ইশক ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী।

তখন উর্দূ সাহিত্যেরও বিভিন্ন পুস্তিকা ও উপন্যাস পড়তাম। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'আলহেলাল'ও কয়েক খণ্ড পড়েছি। তাঁর রচিত 'তাযকেরা' ও 'মাসআলায়ে খেলাফত'ও পড়েছি। এগুলোর অনেক লেখা বারবার পড়েছি। এই ধারাও বেশিদিন চলেনি। দুয়েক বছরের মধ্যে কেটে গেছে।

পরে একসময় কিছুটা ইলমী মেযাজ তৈরি হল। সেক্ষেত্রে মাওলানা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলাইমান নদভীর অবদানই বেশি। মাওলানা শিবলী নোমানীর রচনাবলির মধ্যে সম্ভবত প্রথম পড়েছি 'আলমামুন' ও 'আলগাযালী'। তাঁর রচনাশৈলী, উপস্থাপন কৌশল ও বিশ্লেষণধারা একেবারে হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করত। ফলে তাঁর লেখার এমনই ভক্ত হয়ে গেলাম যে, তাঁর সকল কিতাব সংগ্রহ করে করে পড়ে ফেললাম। 'আলফারূক' ও 'সীরাতুন্নবী' কয়েকবার পড়লাম। এই দুই কিতাবের ভূমিকা কতবার পড়েছি হিসেব নেই।

সেসময় সায়্যিদ সুলাইমান নদভীর 'আরদুল কুরআন'-এর উভয় খণ্ড, 'সীরাতে আয়েশা', 'ইমাম মালেক' ইত্যাদি মুতালাআ করলাম। এতে লেখকের অধ্যাবসায় ও মেহনত, সংকলন ও বিন্যাস এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর সুনিপুণ দক্ষতা ও মুগ্ধকর উপস্থাপনা হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করল। সেজন্য তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'মাআরিফ'-এর গ্রাহক হয়ে গেলাম। তখন থেকে কেবল সাহিত্যের বই-পুস্তক ও ম্যাগাজিনের পরিবর্তে ইলমী ও গবেষণাধর্মী পুস্তক পত্রিকা পড়তে শুরু করলাম। 'মাআরিফ' নিজেই সংগ্রহ করতাম। এছাড়াও 'জামিয়া', 'উর্দূ', 'যামানা' ইত্যাদি ম্যাগাজিন অন্যদের থেকে নিয়ে পড়তাম। তখন কেবল সাহিত্য, শব্দ, বাক্য, বাকপটুতা ইত্যাদির পরিবর্তে গবেষণাধর্মী ইলমী বিষয় খুঁজে খুঁজে পড়তাম। অবশ্য মাআরিফ-এর সব লেখা তখন বুঝতাম না। তবে বিশ্বাস করতাম, লেখাটি যেহেতু মাআরিফে ছাপা হয়েছে নিঃসন্দেহে এটি উন্নত ও মানসম্মত। ভাবতাম, লেখক অনেক কষ্ট মেহনত করে এই লেখা তৈরি করেছেন। এজন্য না বুঝলেও আমার কাছে তার মূল্য ছিল অনেক। মাআরিফের প্রতিটি সংখ্যা হেফাযত করে রাখতাম। বছর শেষে বাঁধাই করে নিতাম।

১৯২৬ সালে দাওরায়ে হাদীসের বছর হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.-এর কাছে সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযী পড়ার সৌভাগ্য হল। শাহ ছাহেবের দরস যে কেমন ছিল! উলূম ও ফুনূনের যেন উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা। দরসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অবস্থা। প্রতিদিন দরসে বহু কিতাবের পরিচিতি, মুসান্নিফ ও ইমামদের জীবনী, তাঁদের ইলমী আমলী অবস্থা, তাঁদের ইজতিহাদ ও ইজতিহাদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতেন। বিশেষ করে আল্লামা ইবনুল জাওযী, হাফেয ইবনে তাইমিয়া, হাফেয ইবনুল কায়্যিম, হাফেয ইবনে হাজার -রাহিমাহুমুল্লাহ- প্রমুখদের আলোচনা হত খুব বেশি। শাহ ছাহেবের সেসব তাকরীরের মাধ্যমেই হাফেয ইবনে তাইমিয়া ও হাফেয ইবনুল কায়্যিম রাহ.-এর কিতাবাদির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। তখন এই দুইজনের অনেক কিতাব মুতালাআ করি। অবশ্য তাদের সব কথা বুঝতে পারিনি। কিছু বুঝে কিছু না বুঝে, এভাবেই পড়েছি।

মাওলানা শিবলী নোমানী রাহ.-এর রচনাবলী আমার মাঝে যে ইলমী মেযাজ তৈরি করেছে শাহ ছাহেব রাহ.-এর দরস তাকে আরো পোক্ত করেছে। দরসের বাইরেও আমি শাহ ছাহেবের বিভিন্ন মজলিশে বসতাম। তাঁর সাধারণ ইলমী আলোচনাও দরসের চেয়ে কোনোদিক থেকে কম হত না। আল্লাহর মেহেরবানীতে তা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

শুরুতেই বলেছি, আব্বাজান আমার জন্য আরবী ইংরেজি দু'ধারার পড়াশোনাই একসাথে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দেওবন্দে গিয়ে ইংরেজি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। তাই ফারেগ হওয়ার পর মনে হল, ইংরেজি পড়াও একটা পর্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত করি। কিছু পরীক্ষা দিলাম প্রাইভেটভাবে, কিছু কলেজ থেকে। সবগুলোতেই দ্বিতীয় স্তরে পাশ করলাম। কেবল শেষমেশ এমএ তে প্রথম স্তর লাভ করলাম। বিএ ক্লাশে আমাদের শিক্ষক ছিলেন আগ্রা ইউনিভার্সিটির একজন বাঙালী প্রফেসর। তিনি ইংরেজি ভাষার বড় সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি আমার মাঝে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন। তখন এবিষয়েও অনেকগুলো বই পড়ি। ব্রক-এর ফ্রান্স বিপ্লব, ম্যাকেল-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং হিন্দুস্তানের ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে বেশ কয়েকটি বই পড়ি। সেইসঙ্গে আমীর আলীর 'দ্যা স্প্রিট অফ ইসলাম' কয়েকবার মুতালাআ করি। আজ পর্যন্ত মনে হয় হৃদয়ের আয়নায় সেই দৃশ্যগুলো ভাসছে।

আমার ফারসি মুতালাআ কয়েকটি দেওয়ান (কবিতার বই) আর কয়েকটি ইতিহাসের বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেওয়ানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরাকী, খসরু, নেযামী, জামী, নযীরী, উরফী, খাকানী প্রমুখদের দেওয়ান। এদের সবার দেওয়ান পড়েছি। কিন্তু দেওয়ানে হাফিয ও দেওয়ানে গালিব আমাকে সবচে বেশি মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে দেওয়ানে হাফিয তো আমার একাকিত্বের সঙ্গী, দুঃখ-পেরেশানীর সান্ত্বনা। আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি, যখন কোনো কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন দেওয়ানে হাফিয থেকে দুয়েকটি গযল পড়তেই মন হালকা হয়ে যায়। মনে হয় যেন কোনো দুঃখই ছিল না।

একবার তো তিনি একেবারে পীর-মুর্শিদের মতো কাজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেহেতু বান্দার দোষ লুকিয়ে রাখেন, তাই সবকিছু বিস্তারিত বলা ঠিক হবে না। মূল বিষয় হল, একবার আমি এক কঠিন ফেতনার মধ্যে পড়ে গেলাম। তখন তিনি তাঁর এক কবিতার মাধ্যমে যেন

আমাকে দিক নির্দেশ করলেন। অন্যথা আমি হয়ত গোনাহেই লিপ্ত হয়ে যেতাম। সেইসঙ্গে জান মালেরও বিরাট ক্ষতি হত। তাঁর এই ইহসান আমার কাছে এত বড় মনে হয়েছে যে, কখনো তাঁর এই ঋণ থেকে বোধহয় মুক্ত হতে পারব না। এজন্যই তাঁর দেওয়ানকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি। কয়েকবার তো এই দেওয়ান থেকে 'ফাল' নির্ধারণ করেছি এবং সেগুলো বাস্তবসম্মতও হয়েছে।

জীবনে যা কিছু লিখেছি, পড়েছি এবং এখনো যা কিছু লিখছি পড়ছি– আমার কাছে মনে হয় তার সবই আব্বাজান রাহ.-এর নেক আমল ও নেক নিয়তের বরকত, আম্মাজানের দুআর ফসল। আব্বাজান তো এমন পরিবেশে থাকতেন, যাদের সবাই আরবী পড়াকে ঘৃণা করে। এরপরও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমাকে আরবী পড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে খরচও এত পরিমাণ করেছেন, যেমন কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি তার সন্তানের পেছনে ইংরেজি পড়ার জন্য খরচ করে।

আর আম্মা আমার ইলম ও আমলের তারাক্কির জন্য তাহাজ্জুদের সময় কেঁদে কেঁদে কত দুআ করেছেন। কখনো তিনি চাননি আমার দুনিয়াবী মান-সম্মান ও উঁচু পদমর্যাদা হোক।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুজনকেই দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন এবং আমাকে তাঁদের তামান্না মুতাবেক উত্তম থেকে উত্তম আমল করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

ভাষান্তর : তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব

শিক্ষা পরামর্শ

গোলাম রাব্বানী
মতিহার, রাজশাহী

প্রশ্ন : মুহতারাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আশা করি ভাল আছেন। আমার জানার বিষয় হল, মাযী মুতলাকের সীগা এবং মাযী কারীবের সীগা-এর তরজমা বিভিন্ন আলেম বিভিন্নভাবে করে থাকেন। তো সঠিক তরজমা কী হবে– দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : আপনার এ প্রশ্নটি সম্ভবত দুই-তিন বছর আগে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু এর জবাব লিখতে বিলম্ব করা হয়েছে। কারণ প্রশ্নটির সার্বিক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। এমনিভাবে বাংলাভাষা ও অনুবাদ সম্পর্কে ভালো জানাশোনা রয়েছে এমন আহলে ইলমের সঙ্গে এ বিষয়ে মশওয়ারা করারও প্রয়োজন ছিল।

মাযী মুতলাক ও মাযী করীবের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু মৌলিক বিষয় আলকাউসারের গত রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হি./ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় শিক্ষার্থীদের পাতার শিক্ষাপরামর্শে আলোচনা করা হয়েছে। এখন কেবল অনুবাদ সংক্রান্ত কিছু কথা আরয করছি।

আমার জানামতে সাধারণভাবে এ কথাই প্রচলিত যে, فعل 'ফেয়েলে মাযী মুতলাকের' সীগার বাংলা অনুবাদ হল, 'সে করল' বা 'তিনি করলেন'। আর قد فعل 'মাযী কারীবের' সীগার অনুবাদ হল, 'সে করেছে' বা 'তিনি করেছেন'। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ এবং ভাষার বাস্তব প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, 'করল, করেছে এবং হল, হয়েছে'-উভয় ক্রিয়ারূপ দ্বারাই মাযী মুতলাক এবং মাযী করীব উভয়ের অনুবাদ করা যেতে পারে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবটা সব জায়গায় খাটে না। উভয়ের মধ্যে কাঠামোগত ও ব্যবহারগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। কারণ, যেকোনো সীগা ও ক্রিয়ারূপের দু'ধরনের অর্থ হয়। এক. শব্দের সরফী বা কাঠামোগত অর্থ। দুই. শব্দটি বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার পর তার নাহবী এবং বালাগাতী অর্থ ও মর্ম, যা বাক্যের পূর্বাপর এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বোঝা যায়। তো মাযী মুতলাকের সীগা মূলগতভাবে ক্রিয়ার কাজটি শুধু সম্পন্ন হয়েছে বোঝায়, তার বেশি কিছু নয়। কাজ কতটা আগে শেষ হয়েছে? এক্ষুণি। নিকট অতীতে নাকি দূর অতীতে তা মূল অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কখনো কখনো বাক্যের পূর্বাপর অবস্থা থেকে এমন কিছু আলামত ও অনুষঙ্গ পাওয়া যায়, যা বাক্যস্থ ক্রিয়াটি নির্দিষ্টভাবে নিকট অতীতে বা দূর অতীতে সম্পন্ন হওয়া প্রমাণ বহন করে। এমনকি বালাগাতী মাকসাদে মাযীর সীগা বর্তমান বা ভবিষ্যত ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

এমনিভাবে বাংলাভাষার ক্রিয়াপদ সম্পর্কে একটি মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে– বাংলায় ক্রিয়াপদের কাল রূপ-নির্ভর, অর্থ-নির্ভর নয়। "কারণ ক্রিয়ার কাল একটা ব্যাকরণিক ধারণা। তা সাধারণ সময়ের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ব্যাকরণে কালের চিহ্ন আর অর্থ প্রায়ই পৃথক হয়। যেমন আমরা যখন বলি, 'সে আগামীকাল কানাডা যাচ্ছে, আর ফিরছে না।' তখন আমরা ভবিষ্যত কালের কথা বলি। কিন্তু 'যাচ্ছে' ক্রিয়াপদ থেকে বোঝা যায় যে, আমরা ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ ব্যবহার করেছি। এমনিভাবে 'তিনি গতকাল হাটে যাননি'। এখানে বাক্যটি গতকাল সম্পাদিত ক্রিয়ার কথা বলছে। সুতরাং এটি অতীত কালের উদাহরণ হওয়া উচিত। কিন্তু বাক্যের ক্রিয়াপদ 'যাননি' বর্তমান কালের রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমন, 'আপনি আজ হাটে যাননি')। তাই, এখানে ক্রিয়াপদের কাল বর্তমান হিসেবে ধরা হয়। এধরনের আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। এ ধরনের উদাহরণকে ব্যাকরণে কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয়"। –'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ' অবলম্বনে, দ্রষ্টব্য : পৃ. ২৩৩-২৩৫

ঘটে যাওয়া ঘটনা বা অতীত ঘটনা বোঝাতে বাংলা ভাষায় সাধারণত যেসব ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয় সেগুলোর মূল কাঠামোগত অর্থ এবং বাক্যে সেগুলোর বিশিষ্ট প্রয়োগ ও আলংকারিক ব্যবহার সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি ব্যাকরণের নির্ভরযোগ্য বইপত্র থেকে এখানে পেশ করছি।

সাধারণ অতীত কাল

ভাষাবিদ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়াপদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন– 'আমি ফল খাইলাম'। এখানে খাওয়া কাজটি সাধারণভাবে অতীত বা শেষ হইয়াছে। এইজন্য খাইলাম ক্রিয়ার কাল সাধারণ অতীত।

যে ক্রিয়া সাধারণভাবে অতীত সময়ে হইয়াছে, তাহার কালকে সাধারণ অতীত কাল বলে। –বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ৮৪

একসময়ের বাংলা একাডেমীর পরিচালক ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সাহেব লিখেছেন– "বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার সময়ই সাধারণ অতীতকাল বুঝায়; যথা–'আমি নিদ্রিত হইলাম'। 'সে সেদিন একাকীই কাঁদিল'।" –মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (ব্যাকরণ মঞ্জরী) ২/৪৩০

প্রখ্যাত বাংলা ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরো বিশদভাবে সাধারণ অতীতের পরিচয় তুলে ধরেছেন– "সাধারণ বা নিত্য অতীত–যে ঘটনা কোনো অনির্দিষ্ট অতীত কালে হইয়াছে তাহার জন্য এই 'ইল' প্রত্যয়-যুক্ত সাধারণ অতীত প্রযুক্ত হয়। এই অতীতের একটা পুরাতন নাম 'অদ্যতনী'। উদাহরণ, যথা–...'আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট দারয়হুঘ্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন।' কোনও ঘটনার সাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার কথা এই অতীত প্রকাশ করে বলিয়া ইংরেজীর Historical past-এর অনুকরণে, বাঙ্গালাতে ইহাকে 'ঐতিহাসিক অতীত'-ও বলা হয়। কখনও-কখনও নিত্য-অতীত ক্রিয়া 'এইমাত্র ঘটিল' এই ভাব প্রকাশ করে। –ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ৩২১

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(ক) একটু আগেই কাজ শেষ হয়েছে এমন ভাব প্রকাশের জন্য। যেমন সে এইমাত্র চলে গেল। শুনলাম, পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। –মুহাম্মাদ এনামুল হক রচনাবলী (ব্যাকরণ মঞ্জরী) ২/৪৩০

(খ) বর্তমান নির্দেশ : ওকে তোমার কাছে রেখে গেলাম (যাচ্ছি)।

(গ) আসন্ন ভবিষ্যত সময় বোঝাতে : কাপড়গুলো ঘরে তোল, বৃষ্টি এল বলে। –বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ, পৃ. ২৩৭

বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপের মূল কাঠামোগত অর্থ এবং বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিবেশ অনুযায়ী অর্থের যেসব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– "সাধারণ অতীত– ঘটে যাওয়া ঘটনা বা অতীত ঘটনা যেমন বোঝায়, তেমনই আবার কোনো কোনো ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সদ্য অতীত বোঝায়–'এই এলাম'। অনুমতির ক্ষেত্রে কখনও কখনও আশু ভবিষ্যৎও বোঝায়–'এলাম তাহলে!', 'চলি তাহলে!', 'চললাম তাহলে' প্রায় সমার্থক। কোনো কোনো প্রতিবেশে অব্যবহিত ভবিষ্যতও বোঝায়–'ধর্‌ ধর্‌! গেল গেল!'

সাধারণ অতীত আখ্যান বর্ণনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কালরূপ।" – প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১/২৬৬)

পুরাঘটিত অতীত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন– "ইহার প্রচলিত নাম 'পরোক্ষ' অর্থাৎ যে কার্য্য বক্তার চোখের বাহিরে ঘটিয়াছে। এই অতীত কাল দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে, ক্রিয়ার ব্যাপার বহু পূর্বে অথবা বর্ণিত অন্য (অতীত) ঘটনার পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বিদ্যমান থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে; যথা– 'অতি শিশুকালে আমি একবার খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম;...।" –ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ৩২২

পুরাঘটিত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

অতীতকালের কোনো ক্রিয়ার আগে আরও একটি ক্রিয়া ঘটিয়া গিয়াছিল এমন ভাব বুঝাইতেও পূর্ববর্তী ক্রিয়ায় পুরাঘটিত অতীত কাল ব্যবহৃত হয়; যথা– 'সভায় আমি পৌঁছিবার আগেই তিনি আসিয়াছিলেন'। 'এখানে আসিবার আগেই সে পত্র দিয়াছিল'। –মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (ব্যাকরণ মঞ্জরী) ২/৪৩০-৪৩১

'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে পুরাঘটিত অতীত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সম্পর্কে আরেকটু বিশদভাবে বলা হয়েছে– "অতীতে এই প্রকার– চলে গিয়েছিল, ভেঙ্গে পড়েছিল, আমাকে দেখে হেসেছিল– এই পুরাঘটিত অতীত সাধারণভাবে আর-একটি অতীত ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রকাশ্য বা অনুমিত তুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন এই প্রয়োগগুলিতে : আমি যখন ওখানে যাই তখন অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল। তুমি ভেবেছিলে কী?– না পড়েই পাশ করে যাবে?

প্রথম বাক্যের 'যাই' এবং দ্বিতীয় বাক্যের 'পাশ করে যাওয়া' দুটিই অতীত 'কালে ঘটেছে, তার আগে ঘটে যাওয়া ক্রিয়াদুটিতে সম্পন্ন অতীত কালের প্রয়োগ ঘটেছে। কোনো ঘটনা কেউ ভুলে গেছে, ('তুমি কি আমাকে বাজার থেকে গন্ধালেবু আনতে বলেছিলে?'), কিংবা অন্য একটি অতীত ক্রিয়া এসে তাকে আরও অতীত করে দিয়েছে, (আমি তো ঠিকই করেছিলাম বলব, তার আগেই তুমি কথাটা বলে ফেললে?)– এই রকম নানা প্রতিবেশে পুরাঘটিত অতীতের ব্যবহার হয়। বলার সময় থেকে এই অতীতের দূরত্ব কতটা, তার হিসাব সরল নয় : 'ও তো একটু আগেই এসেছিল, কোথায় গেল সে ছেলেটা?' –প্রাগুক্ত ১/২৬৭-২৬৮

সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান

ক্রিয়ার যে কালরূপ নিয়মিত বা সাধারণত ঘটে– সাধারণ বর্তমান কাল এমন অবস্থা বোঝায়। যেমন : করে, বলে, হাসে, যায়, ওঠে ইত্যাদি। এ হল মূল কাঠামোগত অর্থ। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রায়ই এই ক্রিয়ারূপটি অতীত ঘটনার জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন– "বাঙ্গালায় বহুশঃ কোন অতীত ঘটনা অথবা ঐতিহাসিক ঘটনা জানাইবার জন্য অতীত কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয়। যেমন– আকবর বাদশাহ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হয়েন; ..."। তিনি পুরাঘটিত অতীতের আলোচনায় আরো বলেন– "ঐতিহাসিক ঘটনা-বর্ণনায় এই পুরাঘটিত অতীতের স্থানে, অতীতার্থে বর্তমানের প্রয়োগ বাঙ্গালায় খুবই হইয়া থাকে।" –ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ৩২০, ৩২২

সাধারণ বর্তমানের আরো কিছু বিশেষ প্রয়োগ রয়েছে। যদি, যখন, যতক্ষণ, যেবার, পাছে ইত্যাদি শব্দ থাকলে কিংবা অতীত কালের উল্লেখ থাকলে সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়া অতীত কালের দ্যোতক হয়। যেমন : যখন জলোচ্ছ্বাস হয় আমি তখন স্কুল ছেড়েছি,...। প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতেও বর্তমানের কালরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তিনি বলেন,...। এমনিভাবে সাধারণ বর্তমান ক্রিয়ারূপের শেষে নাই, 'নি' ইত্যাদি নিষেধার্থক অব্যয় যোগ করে অতীত কাল নির্দেশ করা হয়। যেমন– 'তিনি গতকাল হাটে যাননি'। –বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অবলম্বনে পৃ. ২৩৪-২৩৫

পুরাঘটিত বর্তমান কাল

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন– "যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু যাহার ফল এখনও বির্দ্যমান, অথবা যাহার জের বা প্রভাব এখনও চলিতেছে, তাহা পুরাঘটিত বর্তমান। যথা– আমি কালই তাহাকে দেখিয়াছি; কলিকাতায় আসিয়াছি চারি বৎসর হইল; বৃষ্টির দরুন রাস্তায় কাদা হইয়াছে।' এই কালের চলিত নাম 'হ্যস্তনী'–'হ্যঃ' অর্থাৎ গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে; কিন্তু এই কাল দ্বারা এইভাবে গত-কল্যের সময়-নির্দেশ ঠিক নয়। –ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ৩২২

ড. এনামুল হক সাহেব আরো স্পষ্ট ভাষায় লেখেন– কিঞ্চিৎপূর্বে অথবা বহুপূর্বে ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ সেই ক্রিয়ার ফল এখনও বর্তমান, এমন ক্ষেত্রে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা– গেল বারে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আজই তাহাকে পত্র দিয়াছি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-রাজত্ব এদেশ হইতে বিদায় নিয়াছে। –মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (ব্যাকরণ মঞ্জরী) ২/৪২৯, আরো দেখুন : বাঙ্গালা ব্যাকরণ; ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পৃ. ৮৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রিয়াপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন– "বাংলায় থাকার কথাটা যখন জানাই তখন বলি– আছি বা আছে, ছিলে, ছিল বা ছিলুম। আছিল শব্দেরই সংক্ষেপ 'ছিল'। কিন্তু ভবিষ্যতের বেলায় হয় 'থাকব'। বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে, করছে, করেছিল, করছিল– এই শব্দগুলো আছি ক্রিয়াপদকে ভিত্তি করে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে 'চলা থা', চলেছিল। কাজটা যদিও 'চলা' তবু 'থা' শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।" (দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষার পরিচয় পৃ. ৫৫; রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ২৬, পৃ. ৪৪২)

'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (১/২৬৭) গ্রন্থে পুরাঘটিত বর্তমান ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সম্পর্কে একটু ভিন্ন আন্দাযে বলা হয়েছে– "বর্তমান কালের এই প্রকারে ক্রিয়ার কাজ

শুধু সম্পন্ন হয়েছে বোঝায়, তার বেশি কিছু নয়- 'আমি বলেছি, তিনি খেয়েছেন, লোকটা চলে গেছে।' কতটা আগে শেষ হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

যাহোক বোঝা গেল, বাংলা ভাষায় পুরাঘটিত বর্তমানের ক্রিয়ারূপ কাঠামোগতভাবে পূর্বেই শেষ হয়ে যাওয়া কোনো ক্রিয়ার ফল বা প্রভাব বর্তমানে বিদ্যমান থাকা বোঝায় কিংবা ক্রিয়ার কাজ শুধু সম্পন্ন হয়েছে বোঝায়, তার বেশি কিছু নয়। ক্রিয়া কতটা আগে শেষ হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্রিয়ার ফল বলতে এখানে ক্রিয়ার কার্যকারিতা উপস্থিত থাকা বোঝানো হয়েছে। যেমন ধরুন- কেউ বলল, 'আমি খেয়েছি'। তার মানে আমার এখন খাওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার খাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 'তিনি বসেছেন' অর্থাৎ তার বসার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে এবং তার বসার অবস্থা ও কার্যকারিতা এখনো বিদ্যমান।

আমরা যেসব ভাষার সাথে পরিচিত তার মধ্যে উর্দূ ভাষার ব্যাকরণে যাকে মাযী করীবের সীগা বলা হয় তার অর্থও খুবসম্ভব বাংলা ভাষার পুরাঘটিত বর্তমানের ক্রিয়াপদের অনুরূপ। এজন্য উর্দূ ব্যাকরণের আধুনিক অনেক লেখক মাযী করীবের পরিবর্তে 'হালে তামাম' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। উর্দূ ভাষার এক আধুনিক গবেষক উর্দূ ক্রিয়াপদ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি-

حال تمام کا صیغہ اصل فعل کی حالیہ تمام اور فعل "ہونا" کے حال کے مفرد صیغوں سے بنایا جاتا ہے، جیسے " لڑکا آیا ہے"-

حال تمام کا استعال یہ دیکھ کر بتایا جاسکتا ہے کہ گزرے ہو کام کا بولنے کے وقت سے کیا تعلق ہے- اس لحاظ سے حال تمام کی استعال کے حسب ذیل تین اوقات ہیں :

١- کام بولنے کے وقت سے ذرا پہلے یا بہت پہلے ہوا ہے لیکن اسکا نتیجہ بولنے کے وقت ظاہر ہونا ضروری ہے-

حال تمام کا صیغہ یہ نہیں ظاہر کرتاہے کہ کام کو ہوئے کم وقت گزراہے، وقت کی قلت کا اظہار جملے میں مناسب الفاظ کے ذریعہ ہو جاتا ہے-

قواعد کی کتابوں میں حال تمام کو ماضی قریب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتاہے کیونکہ جملوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی کہ ان صورتوں میں ماضی قریب کے معنی خود صیغے سے نہیں بلکہ جملے کے اورالفاظ سے نکلتے ہیں، جیسے " ابھی " " تھوڑی دیر ہوئی "وغیرہ- ئے

٢- حال تمام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کام بولنے کے وقت سے پہلے کسی وقت ہوچکاہے اور کہنے والا اسے حال سے ملا کر جملے میں" اب تک" یا "آج تک" کا مفہوم پوشیدہ کردیتا ہے-

٣- حال تمام ماضی کو حال بنا کر پیش کرتا ہے (یعنی حال حکائی)-(اردو افعال : ترقی اردو بیورد نئی دہلی ص ١٩١-١٧٧، اور دیکھئے : قواعد اردو مولفہ پروفیسر فدا علی خان، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ ص ٢٢٩)

পুরাঘটিত বর্তমানের বিশেষ প্রয়োগ

(ক) অতীত সময় বোঝাতে : দশ বছর হল তার বাবা মারা গেছেন। গত মাসে তাকে ঢাকায় দেখেছি।

(খ) ভবিষ্যত সময় বোঝাতে : সেও এসেছে আর তোমারও যাওয়া হয়েছে। সে আগামীকাল কানাডা যাচ্ছে, আর ফিরছে না। -বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ পৃ. ২৩৬

উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে আমরা লক্ষ করেছি, 'দেখিয়াছি, আসিয়াছি, হইয়াছে, দিয়াছি, খাইয়াছি'- এ ধরনের ক্রিয়াপদকে বাংলা ব্যাকরণে 'পুরাঘটিত বর্তমান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরাঘটিত শব্দের অর্থ হল : 'আগে ঘটেছে এমন'। এ ধরনের বাংলা ক্রিয়ারূপকেই অনেকে আরবীর قد فعل এই ওজনের 'মাযী কারীবের' সীগার সমার্থক মনে করে থাকেন। কিন্তু তা পুরোপুরি ঠিক মনে হয় না। কারণ বাংলার 'পুরাঘটিত বর্তমান' মূলগতভাবে সরাসরি নিকট অতীত বোঝায় না, যা আমরা একটু আগে ব্যাকরণের উদ্ধৃতিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বরং বাংলা ভাষার ব্যাকরণে যাকে সাধারণ অতীতকালের ক্রিয়াপদ বলা হয়, অর্থাৎ করল-করলেন-গেলেন-বললেন- এধরনের ক্রিয়ারূপ নিকটতম অতীতের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। এ ধরনের ব্যবহারকে যদিও বাংলা ব্যাকরণের বইয়ে সাধারণত বিশিষ্ট প্রয়োগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এধরনের ক্রিয়াপদকে সরাসরি 'সদ্য-অতীত কালের ক্রিয়াপদ' নামেই অভিহিত করেছেন। দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষার পরিচয় পৃ. ৩৩, ৪৬; রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ২৬, পৃ. ৪১২, ৪৩০

এমনিভাবে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন- "আমি এইমাত্র পড়িলাম। 'পড়িলাম' ক্রিয়াপদ দ্বারা বুঝাইতেছে যে, কার্যটি এইমাত্র শেষ হইল। ইহাকে সাধারণ (বা অদ্যতন) অতীত বলে"। -বাঙ্গালা ব্যাকরণ পৃ. ৮৫

লক্ষ করব ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি আমরা প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি। একটু আগে আমরা উল্লেখ করেছি- 'সাধারণ অতীত আখ্যান বর্ণনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কালরূপ।' কারণ ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত কাল রূপটাই বাংলা কথাসাহিত্যে লেখকদের হাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই কালরূপটিকেই গল্প ও কাহিনী বর্ণনায় মূল কাঠামো হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং এর সঙ্গে মিলিয়েই প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যতর কালরূপ ব্যবহার করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে এই সাধারণ অতীত কালরূপটি ব্যবহারের একটা আলাদা আবেদন ও তাৎপর্য রয়েছে। ক্রিয়াপদের এই রূপটির কাজই হচ্ছে, কাজের কথাটি সরাসরি হাজির করা; এবং এই রূপটির রেখে যাওয়া ঢেও হচ্ছে, ঐ যা ঘটে গেল তার রেশ এখনো রয়েছে, এখনো সেটা ফুরিয়ে যায়নি। যেমন, একটি লেখার অংশ- "সে ঘরের ভেতর এলো। দেখলো ঘরে কেউ নেই। বারান্দায় গেলো, সেখানেও কেউ নেই। তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। সে চুপ করে বিছানার ওপর বসে রইলো, যেন কারো জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো"।

সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করে লেখা এই অংশটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি, লেখক চান 'সে' চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘরে ঢুকি, ঢুকে চরিত্রটির সঙ্গেই আবিষ্কার করি যে, ঘর শূন্য। তারই পাশাপাশি হেঁটে আমরা বারান্দায় যাই এবং ফিরে এসে তারই মতো কারো জন্য অপেক্ষা করি। অর্থাৎ ঘটনাটি আমাদের খুব কাছে এবং চোখের ওপরই ঘটছে এবং এক্ষুণি, এইমাত্র তা ঘটে গেল।

বাকি থাকল অনুবাদ প্রসঙ্গ। তো এতক্ষণ ব্যাকরণের উদ্ধৃতিতে যে আলোচনা পেশ করা হল তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি- মাযী মুতলাক এবং মাযী করীবের সরফী বা কাঠামোগত তরজমা 'করল বা করেছে' উভয় রকম হতে পারে। তবে কোনো আরবী নস ও ইবারতের অনুবাদের ক্ষেত্রে 'মাযী

(বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়)

কথা বলে নেকড়ে

আবু আহমাদ

তুমি কি কখনো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীকে কথা বলতে দেখেছ? হয়ত তোতা, ময়না বা টিয়া পাখিকে কথা বলতে শুনেছ। মানুষের কথা শুনেশুনে ওরা হুবহু মানুষের মত কথা বলে। কিন্তু কখনো কি শুনেছ– নেকড়ে কথা বলে? তুমি হয়ত নেকড়ে চেনো না। নেকড়ে দেখতে অনেকটা শেয়ালের মত। তবে খুব হিংস্র। দেখলেই ভয় লাগে! ওরা দলবেঁধে চলে এবং বনের পশুদের উপর আক্রমণ করে। তো আজ আমি তোমাদের নেকড়ে কথা বলার কাহিনী শোনাব।

এর আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। বল তো, পৃথিবীর সব মানুষই কি কথা বলতে পারে? সবার কি কথা বলার শক্তি আছে? তুমি নিশ্চয় জান– পৃথিবীতে কিছু মানুষ তোমার মতই দেখতে, তোমার মতই তাদেরও মুখ-জিহ্বা-দাঁত রয়েছে; কিন্তু তুমি যেমন কথা বলতে পার তারা পারে না। ওদেরকে বলে, বোবা–বাকশক্তিহীন। তো মানুষ কথা বলতে পারে; কিন্তু সেই মানুষই কথা বলতে পারে, যাকে আল্লাহ কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। অন্যথায় আমার তোমার মত মুখ-জিহ্বাওয়ালা মানুষও কথা বলতে পারে না। জিহ্বা কথা বলার একটি মাধ্যম, আসল বিষয় হল, কথা বলার শক্তি বা বাকশক্তি; যা আল্লাহ দান করেন। এজন্যই তো আমরা দেখি জিহ্বা থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ কথা বলতে পারে না। মূলকথা হল, যাকে বা যে বস্তুকেই আল্লাহ কথা বলার শক্তি দান করবেন সে-ই কথা বলতে পারবে। জিহ্বা ছাড়াই কথা বলতে পারবে।

তো কথা বলার শক্তি– আল্লাহর দান, আল্লাহর নিআমত। সুতরাং আল্লাহ যাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তাদের উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা; ভালো কথা বলা, সত্য কথা বলা এবং মানুষকে ভালো কাজের দিকে ডাকা; মিথ্যা বলা, কাউকে গালি দেওয়া, অন্যের দোষ বলে বেড়ানো, কাউকে অপমানিত করা, কাউকে লজ্জা দেওয়া, মন্দ নামে ডাকা– এসব মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

কাল কিয়ামতের দিন আমাদের হাত-পা-চোখও কথা বলবে; এমনকি হাদীসে আছে, দুনিয়াতেও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে। আমরা যদি আমাদের হাত দিয়ে খারাপ কিছু ধরি, আমাদের পা দিয়ে খারাপ পথে যাই, আমাদের চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখি, আমাদের কান দিয়ে খারাপ কিছু শুনি তাহলে আমাদের হাত আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে; আমাদের পা আমাদের অন্যায়ের কথা বলে দিবে, অমাদের চোখ বলে দিবে– আমরা চোখ দিয়ে কী দেখেছি, কান বলে দিবে– আমরা কী শুনেছি। তেমনি ভালো কাজ করলেও আমাদের ভালো কাজের সাক্ষী হবে আমাদের হাত-পা-চোখ-কান। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ আমাদের অঙ্গগুলোকে কথা বলার শক্তি দিবেন আর এগুলো আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করবে; বলে দিবে দুনিয়াতে আমরা কী করেছি, তখন আমরা বলব–

لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا.

(আমাদের নিজেদের হাত-পা, নিজ শরীরের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও) কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে!

তখন আমাদের হাত-পা-কান বলবে–

أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِىْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ.

আল্লাহ আজ আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন সকলকিছুকে। –সূরা ফুসসিলাত (৪১) : ২১

কোনো গুনাহের কাজ আমরা যত গোপনেই করি না কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি তা না দেখে আল্লাহ তো দেখেন, আর আমি যেখানেই লুকাই না কেন, যত গোপন স্থানেই যাই না কেন আমার হাত-পা-চোখ-কান তো আমার সাথেই থাকে। এগুলোই কাল কিয়ামতের দিন আমার সকল পাপের কথা বলে দিবে, যখন আল্লাহ এগুলোকে কথা বলার শক্তি দিবেন। সুতরাং এসো আল্লাহকে ভয় করি, প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে– সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি।

যাইহোক, কথা অনেক হল; এবার চল শোনা যাক নেকড়ে কথা বলার কাহিনী–

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক নেকড়ে একটি বকরি শিকার করল। বকরির রাখাল যখন দেখল পালের একটি বকরি নেই তো সে খোঁজা শুরু করল। দেখল, একটি নেকড়ে তার বকরি শিকার করেছে। সে ধাওয়া করল নেকড়েটিকে। একপর্যায়ে নেকড়ের মুখ থেকে বকরিটি উদ্ধার করল। বেচারা নেকড়ে হাতে আসা রিজিক হারিয়ে খুব কষ্ট পেল। আল্লাহ নেকড়ের জবান খুলে দিলেন। সে মানুষের মত কথা বলতে শুরু করল। সে বলল, ওহে রাখাল! তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই? যে রিযিক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন তা তুমি আমার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে? এ কাণ্ড দেখে রাখাল তো অবাক। আরে এ কী দেখছি আমি! সত্য না স্বপ্ন। কী আশ্চর্যের কথা! নেকড়ে দেখছি মানুষের মত কথা বলছে!!

এ কথা শুনে নেকড়ে বলল, আরে রাখাল ভাই! আশ্চর্যের আর তেমন কী দেখলে তুমি। তোমাকে আমি এর চেয়েও আশ্চর্য খবর শোনাচ্ছি–

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ.

ইয়াছরিবে (মদীনায়) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমন ঘটেছে। তিনি মানুষকে (শত শত, হাজার হাজার বছর) পূর্বে ঘটে যাওয়া বিষয়ের সংবাদ শোনান।

একথা শুনে রাখাল তার বকরির পাল হাঁকালো মদীনার দিকে। মদীনায় পৌঁছে সে নবীজীর কাছে গেল এবং সব ঘটনা খুলে বলল। নামাযের সময় হল। সকল সাহাবী নামাযে এলেন। নামায শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালকে বললেন, সকলকে শোনাও তোমার কাহিনী। রাখালের মুখে সবাই শুনল নেকড়ে কথা বলার কাহিনী। সবাই শুনে আশ্চর্য হল। নবীজীর প্রতি তাদের ঈমান আরো মজবুত হল। নবীজী ইরশাদ করলেন–

صَدَقَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ.

হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! কিয়ামত কায়েম হবে না; যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণীরা মানুষের সাথে কথা বলবে, এমন কি চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৯২; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৪৪৪; ৬৪৯৪; শরহু মুশকিলিল আসার, হাদীস ৬১৭৮; আলমুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনু হুমাইদ, হাদীস ৮৭৭ ●

আমাদের রাজ্য শাসন-২৩

মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়ায়ী

বনী উমাইয়ার খেলাফত

হযরত মুআবিয়া রা.

রাষ্ট্রব্যবস্থা

হযরত হাসান রা.-এর সাথে সমঝোতা চুক্তির পর পূর্ণ শাসনব্যবস্থা হযরত মুআবিয়া রা.-এর হাতে চলে আসে। ২৫ রবিউল আওয়াল ৪১ হিজরী তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করা হয়। এতে করে মুসলমানদের মাঝে দীর্ঘ সময় পর আবার ঐক্য সূচিত হয়। এরপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের হাতেই খেলাফতের দায়িত্ব অব্যাহত থাকে।

হযরত মুআবিয়া রা. অত্যন্ত বিচক্ষণ ও যোগ্য শাসক ছিলেন। প্রজাদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল খুবই নম্র ও আন্তরিক। একেবারে বাধ্য না হলে কাউকে শাস্তি দিতেন না। তাঁর এই কৌশল ও কর্মপন্থার ফলে গোটা দেশেই শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয়।

অবশ্য ইরাকে তখনো কিছু বিশৃঙ্খলা চলছিল। তিনি ভাবলেন, নম্রতার সাথে সুরাহা হয়ে গেলেই ভালো। কিন্তু ইরাকিরা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাদের দুষ্টুমির কিছু নমুনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে যত সুযোগ দেওয়া হয় এবং যতই সমীহ করা হয় তাদের আশকারা বেড়ে যায় এবং দুষ্টুমিতে মেতে ওঠে। অগত্যা যখন কোনোভাবেই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা গেল না তখন হযরত মুআবিয়া রা. যিয়াদকে তাদের শাসক হিসেবে প্রেরণ করলেন। বসরা পৌঁছে যিয়াদ এক কঠোর ভাষণ দিলেন। তিনি সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন–

প্রত্যেকের উচিত নিজ পরিবার ও গোত্রের লোকদেরকে অনিষ্ট ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত রাখা। অন্যথায় অপরাধীর পরিবর্তে নিরপরাধ লোককেও শাস্তি পেতে হবে। অপরাধ করে কেউ পালিয়ে গেলে উপস্থিত লোকদেরকে ধরা হবে। রাতে চলাফেরা করলে হত্যা করে দেওয়া হবে। কেউ কারো বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলে আমি তাকে জ্বালিয়ে দেব। কারো ঘরে সিঁধ কাটলে আমি তার কলিজা ছিঁড়ে নেব। কেউ কাফন চুরি করলে ওই কবরেই তাকে জীবিত পুঁতে রাখব। কেউ জাহিলিয়াতের কোনো কথা বললে তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলব।

তবে আইন-কানুন মেনে চললে ভালো আচরণ করা হবে। অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা। দিনরাত যে কোনো সময় আসতে পারে। আমি তাদের প্রয়োজন পূরণে সদা প্রস্তুত।

যিয়াদ শুধু ভাষণ দিয়েই বসে থাকেননি। পরিপূর্ণভাবে তার বাস্তবায়নও করেছেন। যার ফলে অল্পদিনের ব্যবধানেই সব ধরনের ফেতনা-বিশৃঙ্খলা শেষ হয়ে যায়। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা এই স্তরে উন্নীত হয় যে, ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের দরজা খোলাই থাকত। কেউ চোখ তুলে তাকানোরও সাহস করত না। রাস্তায় কারো কিছু পড়ে গেলে তা সেভাবেই থাকত। অন্যদিকে খারেজীদের শক্তিও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়।

বিজয়সমূহ

হযরত মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে রোমকদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবক'টি যুদ্ধেই মুসলমানরা জয়লাভ করে। তবে শেষ দিকে কুসতুনতুনিয়ার উপর শক্তিশালী আক্রমণ করলেও মুসলমানরা সফলতা পায়নি।

আফ্রিকা শাসনের দায়িত্ব ছিল উকবা ইবনে নাফে'-এর উপর। তাঁর নিরলস চেষ্টায় আশপাশের বর্বর অঞ্চলগুলোও মুসলমানদের দখলে আসে। এর ফলে মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। উকবা ইবনে নাফে' এতদঞ্চলে কায়রাওয়ান শহরের গোড়াপত্তন করেন এবং একটি সেনানিবাস নির্মাণ করেন।

উকবা ইবনে নাফে'র সাহসিকতার নজির হল, যখন স্থলভাগ জয় করতে করতে মৃত সাগরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সমুদ্রের বুকেও ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কিন্তু স্থলভূমি না পেয়ে নিবৃত্ত হলেন এবং বলতে লাগলেন–

"হে আল্লাহ! সমুদ্রের এই জলরাশি না হয়ে যতদূর স্থলভূমি পাওয়া যেত আপনার পথে লড়াই করে যেতাম।" ●

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

(অনুবাদ : আবদুল্লাহ ফাহাদ)

শিক্ষা পরামর্শ

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

মুতলাকের' সীগার বাংলা অনুবাদ বাক্যের পূর্বাপর আলামত ও অবস্থা অনুসারে 'করল-করেছে-করে-করেছিল'– এই ক্রিয়ারূপগুলোর যে-কোনোটি ব্যবহার করা যায়। আর মাযী করীবের বাংলা অনুবাদে 'করল-বলল-দেখল-শুনল-এল-গেল'-এর মতো সাধারণ অতীত কালরূপ ব্যবহার করাই অধিক মানানসই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'করেছে-বলেছে-দেখেছে- শুনেছে-এসেছে-গিয়েছে'-এর মতো পুরাঘটিত বর্তমানের কালরূপ ব্যবহার করাও ঠিক আছে। এছাড়া মূল ক্রিয়ার সাথে 'এখন, এইমাত্র, এক্ষুণি, এতক্ষণ' এজাতীয় সহায়ক শব্দ ব্যবহার করে মাযী করীব আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায়। এমনিভাবে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমেও উপরোক্ত ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন, করে ফেলল, বলে ফেলল, উঠে পড়ল ইত্যাদি। মোটকথা বক্তব্যের ভাব, ভঙ্গি, সুর ও ছন্দ এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোনো একটি কালরূপ নির্বাচন করতে হবে। আর তা সম্ভব হবে ব্যাকরণ-সচেতনতা এবং সাহিত্যরুচির মাধ্যমে। ●

(*উত্তর প্রদানে :* মাওলানা আবদুল মাজীদ)

পর্দানশীন

নওমুসলিম এক নারীর ঈমানদীপ্ত কথা

মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরী রাহ.

দ্বীন-ইসলামের হেফাযত ও মুসলিম মিল্লাতের সুরক্ষার জন্য কুরবানী ও আত্মত্যাগের বিকল্প নেই। যুগে যুগে বহু গুণীজন এ কুরবানীর নাযরানা পেশ করে গেছেন। যারা কুরবানী করেছেন তাঁরা সফল হয়েছেন। এমনই একজনের ঘটনা–

আমেরিকার কোনো এক মহকুমার সেক্রেটারী ছিলেন এক নারী। ধর্মে খ্রিস্টান। হঠাৎ কী মনে করে তিনি বিভিন্ন ধর্মের বই-পুস্তক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। একপর্যায়ে ইসলামকেই তার কাছে সত্য মনে হল। সত্য যখন উদ্ভাসিত হয়েছে– ব্যস, কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ছুটে গেলেন মুসলমানদের কাছে। মুসলমানগণ যদ্দুর বলার বললেন। সাথে সাথে এ-ও বলে দিলেন যে, ইসলাম নারীকে পর্দার কথা বলে। সে রাতেই তিনি বোরকার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন সকালে অফিসে গেলেন পর্দা করে– বোরকা-আবৃত হয়ে।

অফিসে প্রবেশ করতেই সবাই হকচকিয়ে গেল। কালো কাপড়ে ঢাকা এ আবার কে? জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

: আমি অমুক; মুসলমান হয়েছি।

: মুসলিম নারীগণ কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে নাকি?!

: হ্যাঁ, বোরকা পরেই থাকা উচিত।

: আমেরিকায় তো অনেক মুসলিম নারী রয়েছে। কই তারা তো খ্রিস্টান নারীদের মতই পর্দা ছাড়া থাকে! ইসলামে পর্দার বিধান থাকলে তারাও তো পর্দা করত।

: কেউ যদি মুসলমান হয়েও তার নবীর কথা না মানে, তাহলে আমার কী করার আছে? আমি তো ব্যস, যে নবীকে মেনে নিয়েছি তাঁর কথা মতই চলব।

: এ অবস্থায় তো আমরা তোমাকে অফিস করতে দিতে পারি না।

: কুছ পরোয়া নেহি। রুজির ব্যবস্থা তোমরা কর না; আল্লাহই করেন।

মানুষ যখন সঠিক পথে চলতে চায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার সামনে রাস্তা খুলে দেন। শরীয়ত মোতাবেক হালালের গণ্ডিতে থেকে কেউ যদি পথ চলতে শুরু করে, তাহলে আল্লাহ পাকের দরবারে আশা, অন্য সকল পথের যাত্রী অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

তিনি সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে, যাতে একে তিনি সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিক সম্প্রদায় তা অপছন্দ করে। –সূরা ছফ (৬১) : ৯

তাই সহীহ তরিকা অবলম্বনকারী ব্যক্তি ভুল পথের অনুসারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েই থাকে।

যাইহোক, আমেরিকাপ্রবাসী জার্মান নাগরিক এ নারী উচ্চ সম্মানের পদ ও পদবী ছেড়ে ভিন্ন কর্ম গ্রহণ করলেন। পেটের দায়ে এখন তিনি মানুষের ঘর-বাড়িতে আয়া-বুয়ার কাজ করতে লাগলেন। এতে যা জোটে তাতেই দিনগুজরান করতে থাকলেন।

আল্লাহর কী হুকুম! একদিন তিনি বাইতুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হজ্বের সফরে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে আমাদের পরিচিত ইংরেজী শিক্ষিত এক ভাই তার মেযবান হলেন। তারা যথাসাধ্য তার একরাম করলেন। আদর-যত্নের সাথে মেহমানদারি করলেন।

আল্লাহর ঘরের সামনে বসে তিনি খুব দুআ করতেন। জারজার হয়ে কাঁদতেন– হে আল্লাহ! আমি তোমার মেহমান! আমার কী যোগ্যতা আছে– তোমার ঘরের মেহমান হব? আর সামর্থ্য বলতে তো আমার কিছুই নেই। কেবল তুমিই দয়া ও অনুগ্রহ করে তোমার দরবারে এনেছো। ফলে খ্রিস্টানের ঘরে জন্ম নিয়েও আমি আজ বাইতুল্লাহ্‌র ছায়ায়। এ সবই তোমার করুণা হে আল্লাহ!

মদীনা মুনাওয়ারায় রওজায়ে আতহারে দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করে কেঁদে কেঁদে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার এক নগণ্য উম্মত। উম্মতের জন্য আপনার দিলে যে দরদ ও ব্যথা ছিল আল্লাহ যেন আমাকেও তা দান করেন।

তারপর তিনি আমাদের এ ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। এখানকার মুসলিমসমাজের সাথে মেশেন ও ইসলামী কৃষ্টি-কালচার শেখেন। এখান থেকেই কুরআন শেখা শুরু করেন। পরে পাকিস্তান গিয়ে নামায-তিলাওয়াত পুরোপুরি শিখে নেন।

সেখানকার মুসলিমগণ তাকে বলেন– বোন, তুমি আমাদের এখানেই থেকে যাও। এখানে তোমার একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করে দেই।

তিনি বললেন, এখানে তো কুরআন শেখানোর মত, দ্বীন শেখানোর মত অনেক বোনই রয়েছেন। কিন্তু আমেরিকায় আল্লাহর দ্বীনের যে কী এতিমী হালত! সেখানে কুরআন শেখানোর মত কাউকে পাওয়া বেজায় ভার। আর নারীদের মাঝে কুরআনের খেদমত! তা তো বহু দূরের কথা! এজন্য আমাকে আমেরিকায়ই যেতে হবে। সেখানে কুরআনের খেদমত করতে হবে। আমি চাই, সারাজীবন দ্বীনের খাদেম হয়ে থাকতে।

আল্লাহর কী শান! এদিকে আমেরিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ভারত পাকিস্তান সফর করলেন। সে আমাদের এখানে এতেকাফও করেছিল। দাওয়াতের কাজে প্রভাবিত হয়ে সে নিয়ত করে নিয়েছে যে, গোটা জীবন এ কাজ নিয়েই থাকবে। দেশে গিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিল, একমাত্র দ্বীনদার নারীকেই সে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করবে।

ওদিকে ঐ নারী পাক্কা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কোনো দ্বীনদার সঙ্গী পেলে তবেই সংসার পাতব। বহুজন বহুভাবে তাকে

বুঝাল– দেখ, আমেরিকার পরিবেশে দ্বীনদার পাত্র পাওয়া খুবই মুশকিল। সে সাফ সাফ জানিয়ে দিল, মুশকিল হোক বা আসান; দ্বীনদার পাত্র পেলে তবেই বিবাহ বসব। শুনে রাখ, আমার আল্লাহর খাজানায় কোনো কমতি নেই। মুসলমানদের থেকে আমি নামায পড়ে আল্লাহর কাছে চাইতে শিখেছি। তাই আল্লাহর কাছেই চেয়ে যাচ্ছি।

উভয়েই আপন আপন জায়গা থেকে দুআ জারি রাখল। আপনজন পরিচিতজনদের জানিয়ে দিল, আগে দ্বীনদারি দেখতে হবে, তারপর স্ট্যাটাস। দ্বীনদারি ব্যতীত শুধু দুনিয়াদারির কোনো মূল্য নেই।

উভয়ের বসবাস নিউইয়র্কে। মেয়ে জার্মানী বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ পরিবারের সন্তান। আর ছেলে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের। উভয়কে যখন উভয়ের সংবাদ ও সন্ধান দেওয়া হল, ছেলের জন্য তো এটা ছিল আকাশের চাঁদ পাওয়া। কিন্তু মেয়ের জন্য এরকম একটা ছেলেকে মেনে নেওয়া বাহ্যত খুবই মুশকিল ছিল। তবে বাস্তব কথা হল– মেয়ের প্রশ্ন ছিল একটিই। বল, ছেলে দ্বীনদার কি না?

যখন তিনি জানতে পারলেন, ছেলে দ্বীনদার। তাবলীগেও সময় লাগিয়েছে। রাজি হয়ে গেলেন। আশপাশ থেকে আওয়াজ উঠল, কীভাবে তুমি এমন একটি ছেলের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে যাচ্ছো? তার জবাব ছাফ– কালো হয়েছে তাতে কী? সে যদি দ্বীনের উপর চলে আল্লাহ তাআলা তো কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল নূরানী চেহারা দান করবেন। দুনিয়ার এ কয়েকদিন তার চামড়া কালো থাকলে কী যায় আসে? কিয়ামতের দিন যখন আজীবনের জন্য তার চেহারা চকমক করবে, তখন!

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

যেদিন কিছু মুখ হবে আলো–ঝলমলে আর কিছু মুখ হবে মলিন-কালিমাযুক্ত। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১০৬

যাহোক, তাদের 'আকদে মাসনূন' সম্পন্ন হল। মহিলা তার মিশন নিয়ে রইল। স্থানীয় মেয়েদেরকে সে কুরআনুল কারীম শেখাতে থাকল।

একবার এ দম্পতি আমাদের এখানে আসে। আমরা তাদের জামাতকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই। সেখানকার অবস্থা তো আর আপনাদের অজানা নয়– ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা কী পরিমাণ আল্ট্রা মডার্ন–আপটু-ডেট। তারা যখন জানতে পারল, আমেরিকা থেকে এক নারী এসেছে। তাও কি শ্বেতাঙ্গ ঘরানার! সে আলোচনা করবে। ব্যস, তারা ইউরোপিয়ান স্টাইলে সেজেগুজে সেখানকার একটি হলে জমা হল। রঙে ভারতীয় হলেও ঢঙে যেন তার সাথে তাল মেলাতে পারে। যেমনটি অনেকেরই আগ্রহের বিষয় হয়ে থাকে যে, তারা ইংরেজ বনে থাকবে। কথা বলার ঢং থেকে শুরু করে সেকেল-সূরত সব কিছুকে তারা ইংরেজী আদলে করার ফিকিরে থাকে।

তো তারা এভাবে একটি হলে একত্র হল। আমাদের মুবাল্লিগীন বোনেরাও তার মেহমান ছিল।

সবাই যখন এসে হাযির। পাশের কামরা থেকে বোরকা পরা এক নারী হলে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই গেট বন্ধ করে দিলেন– যাতে কোনো পুরুষ আসতে না পারে। উপস্থিত সবার সামনে মুখ খুললেন। হ্যাঁ, আমেরিকার সেই খোলামেলা খ্রিস্টান নারীটিই এখন তাদের সামনে মুসলিম হয়ে পর্দা করে এসেছেন। আর মুসলিম ঘরের মেয়েরা তার সামনে ইউরোপিয়ান সেজে বসে আছে!

তারপর তিনি আলোচনা শুরু করলেন। দিলের দরদে পূর্ণ ছিল তার কথাগুলো। ঈমান-একীনের কথা বললেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বললেন। আরো বললেন, একদিন কিয়ামত হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হবে। হিসাব-নিকাশ হবে। জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের শাস্তির কথাও শোনালেন। সুন্দর করে ছয় নম্বরের বয়ান করলেন।

এরপর যে কথাগুলো তিনি বললেন, তা কেবল তার মুখেই শোভা পায়। বড় হেকমতের সাথে তিনি তাদেরকে বোঝানো শুরু করলেন। গলার স্বর নরম থেকে ধীরে ধীরে গরম হতে লাগল। বললেন, তোমরা নিজেদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বলে দাবি কর। অথচ তোমাদের জীবনযাত্রা এরকম! চিন্তা করে দেখ, নবীর উম্মত হয়ে তোমরা কোন্ পথে হাঁটছো! তার কণ্ঠ আরো ঝাঁঝিয়ে ওঠল– জেনে রাখো, তোমরা যে জীবন গ্রহণ করেছ বা করতে আগ্রহী আমাদের জীবন আগে এটাই ছিল। সে জীবনকে আমরা ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলেছি। তোমাদের আজকের এ জীবন তো ঐ জীবন, যা আমরা ফেলে দিয়ে পবিত্র জীবনে ফিরে এসেছি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করে নতুন জীবন লাভ করেছি।

তার কলজেছেঁচা এ কথাগুলো এভাবেই তাদের কলিজায় গিয়ে বিঁধল। গলায় ঝোলানো দোপাট্টাগুলো ধীরে ধীরে মাথা ঢেকে নিতে লাগল। এখন সবাই তওবার জন্য প্রস্তুত। সবাই তার নিকট ওয়াদা করল, এখন সবখানে নামাযের পরিবেশ কায়েম করবে। যিকির ও তিলাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

আলোচনা শেষে তিনি ফিরে গেলেন নিজ দেশে। কিন্তু তাঁর দরদমাখা নসীহত হল আলীগড়ের নারী শিক্ষার্থীদের নিত্যসঙ্গী– জীবনের পাথেয়। এখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারগুজারী শুনুন। সেখানে হলগুলোর রুম থেকে এখন তিলাওয়াতের সুমধুর গুঞ্জন ভেসে আসছে। যিকিরের পরিবেশ দেখা যাচ্ছে।

তো আমি যা বলতে চাচ্ছি, আমাদের মা-বোনদের দ্বীনের জন্য কুরবানী করার জযবা থাকতে হবে। দ্বীনের উপর চলার যেহনিয়ত পয়দা করতে হবে। যেহেন তৈয়ার হয় তাদেরকে সুন্দরভাবে বোঝানোর মাধ্যমে। এজন্য ঘরে ঘরে তালীমের হালকা করুন। পুরুষগণ যারা পড়তে পারেন ঘরের সবাইকে নিয়ে তালীম করবেন। ঘরে নারী-শিশুরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কখনও পুরুষগণ অধিক ব্যস্ততার দরুণ তালীম করতে না পারলে ঘরের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী সবাইকে নিয়ে তালীম করবেন। নামাযের আমলী মশক করবেন। ●

ভাষান্তর : আশিক বিল্লাহ তানভীর

ফিল হাল

শি ক্ষা - দী ক্ষা

> ‘এখানে স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে যে, কোনটা কাম্য– নৈতিকতাহীন বিদ্যা, না নৈতিকতার আলোয় আলোকিত শিক্ষা। শিক্ষা-দীক্ষার বিপুল বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে যদি নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা না দেয়া যায় তাহলে এই কর্মযজ্ঞই যে সমাজের উঁচু স্তরে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে– উপরের ঘটনাটি তার অসংখ্য দৃষ্টান্তের একটি।’

লিখেছেন– গোলাম এলাহী

মিছে ডক্টর!

মিথ্যাবাদিতা এক চারিত্রিক বিকার। ভয়াবহ পাপ। শুধু পাপই নয়, একে বলা যায় অসংখ্য পাপের জনক। এক মিথ্যাবাদিতা থেকেই জন্ম নেয় নানা অনাচার। অতপর এর বিস্তার যখন ঘটে শিক্ষার অঙ্গনে ও শিক্ষক-সমাজে তখন তা শুধু ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আরো অনেককে সংক্রমিত করে। যে শিক্ষক মিথ্যা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেন জাতি তার কাছে কী আশা করতে পারে?

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭-এর দৈনিক প্রথম আলোতে এই রকম একটি দুঃখজনক ঘটনার নজির দেখা গেল। সংবাদের হুবহু বক্তব্য এরকম–

‘তিনি এখনো পিএইচডির ছাত্র। পড়ছেন যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে শিক্ষার ঝুলিতে ডক্টরেট ডিগ্রিটা এখনো জমা না হলেও দিব্যি তিনি ‘ডক্টর’ উপাধি ব্যবহার করছেন। এই উপাধি নিয়ে তিনি একবার পদোন্নতি পেয়েছেন, আরেকবার নিয়োগে প্রধান্য পেয়েছেন। পিএইচডি শেষ না করেও এই অসদুপায় অবলম্বন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম্‌স বিভাগের শিক্ষক অনুপ কুমার সাহা।...

‘অনুপ কুমার সাহা অবশ্য বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ জমা দিয়েই পদোন্নতি ও নিয়োগ পেয়েছেন তিনি।’

এরপর আছে প্রথম আলোর নিজস্ব অনুসন্ধানের বিবরণ। তাতে বলা হয়েছে, অনুপ কুমার ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে যান। ওয়েব সাইটে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির বিজনেস স্কুলের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের পিএইচডি শিক্ষার্থীদের তালিকায় ১৫ নম্বরে তার নাম। ওয়েব সাইটের ‘দি অ্যাওয়ার্ড অব ডিগ্রি’ অংশটিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় উন্নীত হওয়ার পর একজন পিএইচ-ডির ছাত্রকে তাঁর অভিসন্দর্ভের একটি ই-কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। এরপর তিনি কনগ্রিগেশনে (সনদ প্রদানের অনুষ্ঠান) অংশ নেওয়ার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবেন। সেখানে আরো বলা হয়েছে, পিএইচডির সমস্ত পড়াশোনা এবং গবেষণা জমা দেওয়া হয়ে গেলেও কনগ্রিগেশন ছাড়া কোনো ছাত্র পিএইচডি ডিগ্রি ব্যবহার করতে পারবে না। এই কনগ্রিগেশন অনুষ্ঠান হয় বছরে দু'বার– ৮ জুন এবং ১৫ ডিসেম্বর।

জানতে চাইলে অনুপ কুমার সাহা প্রথম আলোকে বলেন, গত জুন মাসে তিনি কনগ্রিগেশনে অংশ নিয়েছেন। সেখানে তাকে ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটে তাকে পিএইচডির ছাত্র হিসেবে দেখানো হচ্ছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি দেখেছি, ওদের আপডেট দেওয়ার বিষয়ে মেইল দেব।’

তবে অনুপ কুমার সাহার এই দাবি সত্য নয়। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের ওয়েব সাইটের নিচে লেখা রয়েছে ওয়েবসাইটটি সর্বশেষ গত ১৪ ডিসেম্বর তারা হালনাগাদ করেছে। (অথচ অনুপের দাবি ছিল, গত জুন মাসে তিনি কনগ্রিগেশনে অংশ নিয়েছেন।) তাছাড়া ওয়েবসাইটটি ঘেঁটে আরো দেখা যায়, অনুপ কুমার সাহা গত ৬ অক্টোবর ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তাঁর অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ আপলোড করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁর কনগ্রিগেশনে অংশ নেওয়ার প্রক্রিয়া এখনো চলছে। অথচ অনুপ গত এপ্রিলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছেন ওই মাসেরই ২৩ তারিখ।...

রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছে যে, (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের) প্রশাসনিক ভবনে অ্যাকাউন্টিং বিভাগের শিক্ষকদের ফাইল ঘেঁটে দেখা যায়, অনুপ কুমার সাহা পিএইচডি ডিগ্রির কোনো সনদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেননি। তিনি ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোযুক্ত একটি ফটোকপি জমা দিয়েছেন, যেখানে লেখা রয়েছে, ‘এই প্রার্থী পরীক্ষকদের সন্তুষ্ট করেছেন। কনগ্রিগেশন নিশ্চিত করা হবে।’ এই কাগজের নিচে ৬ অক্টোবর তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

(দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭, শেষ পৃষ্ঠায়)

পত্রিকাটির বিবরণ যথার্থ হলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তির বিষয়ে অনুপ কুমার সাহা প্রথম আলোকে যা বলেছেন তা অসত্য। অসত্যকথনকে শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিরাও কোনো দোষ মনে করছেন না। মেধা-মননে অগ্রসর হয়েও নৈতিকতায় কেন এই দেশ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে তার কারণ এখান থেকে অনুমান করে নেয়া যায়। এখানে স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে যে, কোনটা কাম্য– নৈতিকতাহীন বিদ্যা, না নৈতিকতার আলোয় আলোকিত শিক্ষা। শিক্ষা-দীক্ষার বিপুল বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে যদি নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা না দেয়া যায় তাহলে এই কর্মযজ্ঞই যে সমাজের উঁচু স্তরে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে– উপরের ঘটনাটি তার অসংখ্য দৃষ্টান্তের একটি।

এক্ষেত্রে আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা-দর্শনের দিকে। ইসলাম ঐ জ্ঞানকেই জ্ঞান বলে, যা মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে– বিশ্বাসে, কর্মে ও কথায়। সত্যনিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

চিন্তা ও বিশ্বাসে কুসংস্কার পোষণ করে, কর্মে ও আচরণে অন্যায়-অনাচার ধারণ করে আর কথায় মিথ্যাচারী হয়ে কোনো ব্যক্তি কীভাবে জ্ঞানী ও শিক্ষিত হতে পারে? আসলে আল্লাহর ভয় ও তাঁর পরিচয় ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানী ও শিক্ষিত হওয়া যায় না। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহভী-তিই হচ্ছে ঐ জ্ঞানের উৎস, যা থেকে উৎসারিত হয় জ্ঞানের আলোকধারা, যে

ধারায় স্নাত হয় ব্যক্তির মন-মানস, স্বভাব-চরিত্র, আচরণ-উচ্চারণসহ সবকিছু। তখন শিক্ষা ও কর্মের যে অঙ্গনেই এই ব্যক্তি বিচরণ করুক নৈতিকতা ও সত্যনিষ্ঠার এক আলোকবলয় তাকে বেষ্টন করে রাখে।

কুরআন মাজীদের ইরশাদ–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ.

হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গে থাক। –সূরা তাওবা (৯) : ১১৯

এই আয়াত আমাদের সত্যনিষ্ঠ হওয়ার এবং সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গে থাকার আদেশ করেছে। যা অর্জিত হতে পারে ঈমান ও তাকওয়ার দ্বারা। কাজেই মিথ্যাচার ও দুর্নীতিবিরোধী সোচ্চার ভূমিকায় যদি আমরা সত্যনিষ্ঠ হই, তাহলে আমাদের কর্তব্য, ঈমান ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা এবং তাকওয়া ও ঈমানের ধারাকে বেগবান করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করা। এর বিপরীত অবস্থান আমাদের শুধু সত্যের আলোক থেকেই দূরে সরিয়ে দিবে না, আমাদের সোচ্চার কণ্ঠকেও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে। ●

‘বর্তমানে মুসলিম জাতির সাথে দেশে দেশে পৌত্তলিক ও অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর যে অন্যায়-অবিচার তা আমাদের সামনে কুরআন-সুন্নাহর সেইসব বৃত্তান্তেরই সমকালীন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছে। এইসব মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত অতীতকালের পৌত্তলিক জাতি-গোষ্ঠীর মানসিক ও চারিত্রিক অবস্থাও আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলছে।’

উ ম্মা হ

লিখেছেন– আবদুল্লাহ নাসীব

আসামে দুর্যোগের ঘনঘটা

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ‘গণতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রাষ্ট্র ভারতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আরেকটি নমুনা দেখা যাচ্ছে বৃহৎ দেশটির আসাম রাজ্যে। এখানে শুরু করা হয়েছে নাগরিকত্বের জাতীয় নিবন্ধন (এনআরসি)। দেশটির অন্য কোনো রাজ্যে এই নিবন্ধন না হলেও আসাম রাজ্যে তা করা হচ্ছে এবং প্রাথমিক খসড়া তালিকা থেকে ১ কোটি ৩৯ লাখ লোকের নাম বাদ পড়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে আসাম হচ্ছে দ্বিতীয় রাজ্য, যাতে বিপুলসংখ্যক মুসলিমের বাস। গোটা ভারতের জনসংখ্যার ৮০% হিন্দু, ১৪% মুসলমান ও অবশিষ্ট ৬% খ্রিস্টান, শিখ ও বৌদ্ধ। আর এ রাজ্যের অধিবাসীদের ৩৪% মুসলিম। একারণে বিপুলসংখ্যক মুসলিমঅধ্যুষিত আসাম রাজ্যে নাগরিকত্বের নিবন্ধনের নামে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে তা যথার্থই আশঙ্কাজনক।

রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা বিজেপির বক্তব্যও দায়িত্বপূর্ণ নয়। আসাম বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র রুপম গোস্বামী বলেছেন, ‘এতে বিজেপির কোনো হাত নেই। নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ার পুরোটাই চলছে খোদ সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে।’ অথচ বিজেপি গত বছরের মে মাসে রাজ্য-সরকার গঠনের পরই ‘অনুপ্রবেশকারীরা’ স্থানীয় হিন্দুদের কর্মসংস্থান নষ্ট করছে দাবি করে ‘অবৈধ’ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য-সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস সাংবাদিকদের বলেছেন, ২০১৪ সালের আগ পর্যন্ত আসামে আসা হিন্দুরা নিশ্চিন্ত। তবে ‘বিদেশি’ মুসলমানদের রাজ্য ছাড়তে হবে। বিজেপির জোট শরীক আসাম গণপরিষদের রাজ্য সভাপতি অতুল বরার দাবি, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর যাঁরাই আসামে অনুপ্রবেশ করেছে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাদের রাজ্য ছাড়তে হবে।’ কাজেই বাংলাদেশের প্রথম আলোর বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে ভুল নয়–

‘বিষয়টি আইনি নয়, একান্তভাবেই রাজনৈতিক।’ (প্রথম আলো ০২-০১-২০১৮ সম্পাদকীয়)

আর বিজেপির রাজনীতি যে সম্পূর্ণ হিন্দুত্ববাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশের একশ্রেণির মিডিয়া প্রতিবেশী দেশের উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টান্তগুলোকেও ‘সাম্প্রদায়িকতা’ আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে থাকে। পক্ষান্তরে স্বদেশের খাঁটি রাজনৈতিক ঘটনাগুলোকেও নির্দ্বিধায় সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তত নামধামে যে ধর্মের তারা অনুসারী সেই ধর্মের প্রতি তাদের যদি কোনো হৃদ্যতা যদি না-ও থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের ধর্মের প্রতিও যদি কোনোরূপ শ্রদ্ধাবোধ না থাকে, দেশের ভাবমর্যাদার প্রতিও কি কোনো দায়-দায়িত্ব নেই?

কেউ তো বলছে না যে, দেশের ভাবমর্যাদা রক্ষার স্বার্থে অন্যায় গোপন করুন, কিন্তু অসত্য অবাস্তব বিশ্লেষণ দ্বারা দেশ ও জাতির ভাবমর্যাদা যারা ক্ষুণ্ন করেন, অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের সামনে স্বজাতি ও স্বদেশকে খাটো করে পুলকিত বোধ করেন তারা আবার দেশপ্রেমের কথা উচ্চারণ করেন কীভাবে? এটা কী ধরনের দেশপ্রেম? তারা দয়া করে জাতিকে জানাবেন কি– তাদের দেশপ্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ আসলে কী? তথাকথিত দেশপ্রেমিকেরা তাদের দেশপ্রেমের স্বরূপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকুন, আমরা এই অবসরে অন্যদিক থেকে কিছু কথা বলি।

আমরা মনে করি, সম্প্রতি ভারতের আসামে যা ঘটছে, তা নতুন কিছু নয়। এটা ঐ জাহেলী ধারারই সমকালীন দৃষ্টান্ত, যা যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে চলে আসছে। মুসলমানদের কর্তব্য, সমকালীন ভাষা ও পরিভাষার গোলক ধাঁধায় চক্কর না খেয়ে বর্তমানকে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে মূল্যায়ন করা।

কে না জানে যে, মুসলমানদের শুধু ধর্মীয় ও আদর্শগত পরিচয়ের কারণে সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। আপন মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদের ব্যাপারটি তো স্বয়ং শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেই ঘটেছে। তাঁকে মক্কানগরী থেকে হিজরত করতে হয়েছে, মক্কার শ্রেষ্ঠ অধিবাসীদেরকেও ঐ ভূখণ্ড থেকে হিজরত করতে হয়েছে। দ্বীন ও আদর্শের বিরোধী পৌত্তলিক গোষ্ঠীর এই অন্যায়-অবিচার তাই নতুন নয়। শুধু আল্লাহর শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, তাঁর পূর্বসূরি নবী-রাসূল ও তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আচরণও ছিল এমনই– অন্যায়, অযৌক্তিক ও উদ্ধত। কুরআন মাজীদের মনোযোগী পাঠকের এই সত্য অজানা নয়।

বর্তমানে মুসলিম জাতির সাথে দেশে দেশে পৌত্তলিক ও অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর যে অন্যায়-অবিচার তা আমাদের সামনে কুরআন-সুন্নাহর সেইসব বৃত্তান্তেরই সমকালীন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছে। এইসব মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত অতীতকালের পৌত্তলিক জাতি-গোষ্ঠীর মানসিক ও চারিত্রিক অবস্থাও আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলছে।

এখন ভারতের আসাম রাজ্যে যা ঘটছে, অনুরূপ ব্যাপারই ঘটেছিল মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে। রোহিঙ্গা-মুসলিমদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাতের জন্য প্রথমে তাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়ার

কৌশলই অবলম্বন করা হয়েছিল। সেই একই পন্থার পুনারাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে ভারতের আসাম রাজ্যে। এ কারণে বিজেপির মন্ত্রী-এমপিরা যখন আশ্বস্ত করবার জন্য বলছেন, এটি একটি খসড়া তালিকামাত্র। চূড়ান্ত তালিকা থেকে 'বৈধ' নাগরিকেরা কেউ বাদ পড়বে না তখন তা মুসলিমদের আরো বেশি উদ্বিগ্ন করছে। কারণ বৈধতা-অবৈধতার মানদণ্ডই যখন পরিবর্তন হয়ে যায় তখন এই সকল শব্দ-বাক্যই অন্যায়-অবিচারের আশঙ্কা ঘনীভূত করে।

এখন আসাম রাজ্যেও ক্ষমতায় তারাই, যারা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি। মোদীর গুজরাটের ইতিহাসও আসামের মুসলিমদের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়ার এক বড় কারণ।

ইসলাম আমাদের যে ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দান করেছে সে হিসেবে কোনো মুসলিমই এখন নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। একইভাবে যারা স্বদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার ব্যাপারে সংবেদনশীল তাদেরও উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই।

কারণ আসামের মুসলিমদের অভিহিত করা হচ্ছে 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' বলে। এই প্রচার অনেক আগে থেকেই হচ্ছে। বাংলাদেশ যেমন আমাদের স্বদেশ তেমনি তা একটি বৃহৎ মুসলিম ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের শান্তি-স্থিতিশীলতার ব্যাপারে সচেতন থাকা তাই দুই দিক থেকেই জরুরি। প্রতিবেশী বৃহৎ দেশটির বন্ধুত্বের মৌখিক বুলির বিপরীতে এ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি-অগ্রগতি পরিপন্থী নানা তৎপরতার তাৎপর্যও এখানেই নিহিত। অর্থাৎ এই ভূখণ্ডটি একটি মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়ার মধ্যেই নিহিত। কাজেই এই ভূখণ্ডের মুসলমানদের যেমন অন্যান্য ভূখণ্ডের মুসলিম ভাই-বোনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে হবে তেমনি স্বদেশ ও স্বদেশবাসী মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তা, পার্থিব ও পারলৌকিক উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারেও সচেতন ও কর্মনিষ্ঠ হতে হবে। এক্ষেত্রেও ঈমানদার জনগণই আস্থা ও ভরসার জায়গা। কারণ এক পরীক্ষিত বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম ভূখণ্ডে দেশপ্রেমের দাবি ঈমান ও ইসলাম ছাড়া যথার্থ হয় না। ●

‘নারীর নিরাপত্তা যে বাইরে নয়, বরং নিজের ঘরে স্বামী-সন্তানের মাঝে– এ কথা আমাদের আধুনিকমনা মেয়েরা বোঝে না বা বুঝতে চেষ্টা করে না। তাদের মাথায় ভূত সওয়ার হয়ে গেছে, তাকে মিডিয়ায় ক্যারিয়ার গড়তে হবে, তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মিডিয়াও তাকে পিঠ চাপড়ে দেয়। যে মেয়ে যত খোলামেলা হবে, মিডিয়া ততই তাকে সাহসী মেয়ে, সাহসী অভিনয় বলে তারিফ করবে। নিজের সমাজ ও পরিবারকে লাথি মেরে, নিজের ইজ্জত আব্রু বিসর্জন দিয়ে যে মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, সাহসী খেতাব পেতে চায়, সেই মেয়েটি– জীবন, প্রতিষ্ঠা ও সাহসের অর্থ বোঝে কি না সন্দেহ।’

অ ব ক্ষ য়

লিখেছেন– হারিছ তাবীল

সুন্দরের অসুন্দর দিক

কয়েকদিন ধরে পত্রপত্রিকায় সংবাদটি ঘুরে ফিরে আসছে। পিলে চমকে যাওয়ার মত শিরোনামে। কোন্ যুগে বাস করছি এমন প্রশ্নও চলে আসছে মাথায়। লাক্স-চ্যানেল আইয়ের উদ্যোগে শুরু হচ্ছে কথিত সুন্দরী প্রতিযোগিতা। তারা পত্রপত্রিকায় যে শিরোনামে এর বিজ্ঞাপন প্রচার করছে তাকে ভয়াবহ বললেও কম বলা হয়।

'দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়' এমন শিরোনাম দেখলে ভদ্র ঘরের যে কোনো শালীন মানুষ আঁতকে উঠতে বাধ্য। এই শিরোনাম মোতাবেক একজন নারীর অদেখা কিছু থাকতে পারবে না, যা কিছু অজানা এবং যা কিছু অদেখা তা অবলীলায় প্রকাশ করতে না পারলে নারী-স্বাধীনতার সুফল থাকল কোথায়? তাই অজানা-অদেখা জিনিস প্রদর্শনের জন্য ২০০৭ থেকে শুরু হয়েছে তাদের এই আয়োজন।

চলতি বছর এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা আসার পরে এখন পর্যন্ত তাদের প্রকাশিত তথ্য, তাদের ফেসবুক পেইজ এবং অন্যান্য সংবাদ মারফত জানা গেছে বিপুল পরিমাণ উঠতি তরুণী এতে নাম লেখাচ্ছে। এরা নিজেদের শারীরিক প্রদর্শনীতে প্রবল আগ্রহী। বোঝা যাচ্ছে, এইসব কোম্পানী চোখ বন্ধ করে এই কাজে নামেনি। তারা বা তাদের গডফাদাররা নাটক-সিনেমা, নাচ-গান ইত্যাদির মাধ্যমে আগে এমন একটা জাতিগোষ্ঠী তৈরি করেছে, যাদের কাছে নিজের শারীরিক প্রদর্শনী অতি স্বাভাবিক, এমনকি অতি কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সারাদিন টিভি-সিনেমা দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের ওই সুন্দর শরীরটার সার্থকতাই হচ্ছে জগতকে তা প্রদর্শন করার মাঝে; যেমনটা টিভি-সিনেমার লোকেরা করে থাকে।

আয়োজকদের ঘোষণা মোতাবেক যারা এতে শীর্ষস্থান লাভ করবে তাদেরকে নানা পুরস্কারের পাশাপাশি বিভিন্ন নাটক ও সিনেমায় সুযোগ করে দেয়া হবে। অবশ্য এর জন্য নাকি শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গসমূহের মাপজোখ পুরুষ বিচারকদের সামনে পেশ করতে হবে। এমনকি দিতে হবে কুমারিত্বের পরীক্ষা। তবুও এগুলোকে অংশগ্রহণকারীদের কাছে অশ্লীলতা মনে হয় না; কারণ টিভি-সিনেমায় তারা হরদম এসব দেখে অভ্যস্ত। এই ধরনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, প্রয়োজনে আরো অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মেয়েরা শীর্ষস্থান অর্জন করতে চায়। বড় বড় বিজ্ঞাপনে কাজ করে অথবা এসব প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করে কেউ যখন একটু ওপরে উঠে আসে তখনই তারা বড় বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, আমলা ও হোমড়াচোমড়াদের ফোন পায়। আসতে থাকে নৈতিক-অনৈতিক বিভিন্ন প্রস্তাব। বিনিময়ে বিপুল পরিমাণে অর্থ। গাড়ি-বাড়ি আর কথিত অভিজাত জীবনের মোহে পড়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মেয়ে কোনো না কোনোভাবে এসবে জড়িয়ে যায়। আর এই অন্ধকার জগতটাই এমন, একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা মুশকিল।

২০০৭ সালে লাক্সের এই প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হয়েছিলেন সম্প্রতি তার একটি বক্তব্যে মিডিয়াপাড়ায় তোলপাড় চলছে। যেখানে তিনি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এইসব প্রতিযোগিতার অনেক কদাকার দিক ফাঁস করে দিয়েছেন। শালীনতার স্বার্থে আমরা সেই প্রসঙ্গের অবতারণা থেকে বিরত থাকছি।

নারীবাদীদের দ্বিমুখী আচরণে আমাদের বিস্ময় জাগে। এইসব নোংরা প্রতিযোগিতায় মেয়েদের অপব্যবহারকে তাদের কাছে নারীর স্বাধীনতা ও স্বার্থবিরোধী মনে হয় না। তাদের হম্বিতম্বি ও বহুমুখী শ্লোগানকে আমাদের কাছে রহস্যজনক মনে হয়। তারা নারী স্বাধীনতার মূলা দেখিয়ে মেয়েদেরকে বাইরে নিয়ে আসলেন। এরপর সরাসরি ভোগ্যপণ্য বানিয়ে দিলেন। পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য নারীকেও তারা বিজ্ঞাপনের পণ্য বানিয়ে ছাড়লেন। সমাজে আজকে নারীর ব্যবহার যে পদ্ধতিতে হচ্ছে তাকে ভোগ ছাড়া অন্য কোনো শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে পশ্চিমাদের প্ররোচনায়

আমাদের নারীবাদীরা হৈ চৈ করেন তাদের নিজেদের দেশেই আজকে মায়ের জাতি নারী সবচেয়ে বেশি নিগ্রহের শিকার। নারীকে তারা ভোগ করে অতপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মজার ব্যাপার হল ভোগ্যপণ্য হওয়ার মধ্যে নারীর স্বাধীনতা কীভাবে লুকায়িত আছে সেই ব্যাখ্যা তাদের কখনো করতে শোনা যায় না।

নারীর নিরাপত্তা যে বাইরে নয়, বরং নিজের ঘরে স্বামী-সন্তানের মাঝে– এ কথা আমাদের আধুনিকমনা মেয়েরা বোঝে না বা বুঝতে চেষ্টা করে না। তাদের মাথায় ভূত সওয়ার হয়ে গেছে, তাকে মিডিয়ায় ক্যারিয়ার গড়তে হবে, তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মিডিয়াও তাকে পিঠ চাপড়ে দেয়। যে মেয়ে যত খোলামেলা হবে, মিডিয়া ততই তাকে সাহসী মেয়ে, সাহসী অভিনয় বলে তারিফ করবে। নিজের সমাজ ও পরিবারকে লাথি মেরে, নিজের ইজ্জত আব্রু বিসর্জন দিয়ে যে মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, সাহসী খেতাব পেতে চায়, সেই মেয়েটি– জীবন, প্রতিষ্ঠা ও সাহসের অর্থ বোঝে কি না সন্দেহ।

একটা সময় ছিল যখন আমরা গর্ব করে বলতাম, ওড়না-ঘোমটা আমাদের সংস্কৃতি, পর্দা ঝুলানো পালকি আমাদের ঐতিহ্য। ছোটবেলায় দেখতাম শাড়ি বা চাদর দিয়ে রিকশার চারদিক পেঁচিয়ে নববধূরা বাপের বাড়ি যেত। সেই যুগ এখন যাদুঘরে চলে গেছে। তথাকথিত আধুনিকতা আর পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে আমাদের গৌরবান্বিত সংস্কৃতি। আজ মা-দাদীর বয়সী নারীদেরও আটোসাঁটো, বিশ্রী, অরুচিকর পোশাক দেখে রক্তক্ষরণ হয় হৃদয়ে। নিষেধও করা যায় না, তাতে নাকি ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। আহ! আফসোস!!

বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অন্যায় ও অশ্লীলতার ওপর নিজেদের ভিত্তি তৈরি করে নিয়েছে। পুরো সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া এর প্রতিকার মুশকিল। তবে বিপ্লব তো সময়সাপেক্ষ বিষয়। তার আগ পর্যন্ত কিছু করার নাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। বরং এই যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পঁচে যাচ্ছে তার একটা দায় আমাদের ওপরও বর্তায়।

প্রত্যেক এলাকায় গুণীজন-মুরুব্বীরা আছেন। সমাজের বখে যাওয়া যুবকদের প্রতি নজর রাখা এবং মেয়েদের বেপরোয়া চলাচল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকে তারা নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন না। শুধুমাত্র ক্ষমতা অর্জন এবং...। সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধতা আমাদের অভিভাবকদের। একটা সময় পর্যন্ত সন্তান তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, এরপর তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জন্মের পর থেকে দীর্ঘ যে সময়টা সন্তান তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে তখনই যদি সমকালীন সমস্যাগুলোর কথা মাথায় রেখে তাদের মনমানসিকতা সেভাবে গড়ে তোলা হয়, নৈতিক-অনৈতিক এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে বড় হওয়ার পরে সন্তানের সে পথে অগ্রসর হওয়ার আশংকা কম। এই আশংকা সবচেয়ে কমে যাবে যদি সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়। দ্বীনী ইলমের নূর তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে লাইনচ্যুত হওয়া বা বিগড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের অভিভাবকেরা বিষয়টা নিয়ে কি এভাবে ভাবেন? দিনরাত পার্থিব ব্যস্ততার মধ্যে এসব নিয়ে ভাববার ফুরসত কি তাঁদের হবে? ●